অনীক

আগস্ট ২০১৩
বর্ষ ৫০ ❑ সংখ্যা ২
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ

মার্কিন শ্রমিকদের আয় কমছে ❑ মিতা দত্ত ❑ ২
পঞ্চায়েত নির্বাচন ❑ পরিচয় কানুনগো ❑ ৩
বাড়ছে মিলিটারি ব্যয় ❑ শ্যামল দাস ❑ ৬

টাকার পতন

টাকা নিয়ে ভাবনা ❑ জয়তী ঘোষ ❑ ৯
টাকার পতন ❑ রণজয় ভট্টাচার্য ❑ ১০
টাকার দাম ও... ❑ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ❑ ১২

প্রবন্ধ

'এত মাওবাদী কেন?' ❑ সঞ্জীব আচার্য ❑ ১৫
অধিগ্রহণ: উন্নয়ন না... ❑ প্রণব দে ❑ ২২
বিনা বিচারে কারাগারে ❑ বিশ্বজিৎ রায় ❑ ২৭

অন্য চোখে

গুরুস্থানে গোরস্থান ❑ মালবিকা মিত্র ❑ ১৮

স্মরণ

বরুণ দে ❑ শুচিব্রত সেন ❑ ৩৮
ইন্দ্রদাকে যেমন দেখেছি ❑ সন্তোষ রানা ❑ ৩৯

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

পাহাড়ের হাসি!

পাহাড়ের হাসার কথা ছিল, জঙ্গলমহলেরও। কথা ছিল না বেনামে ইনফোসিসকে *সেজ*-এ সুযোগ দেওয়ার বা অন্য নামে চুক্তি চাষ ফেরত আনার প্রচেষ্টার।

পাহাড়ে বিক্ষোভ, জঙ্গলমহল ফুঁসছে। সিঙ্গুরে আপাতত আগুন ছাই-চাপা। পাহাড়ের মানুষের জনপ্রিয় দাবি নিয়ে অবতীর্ণ বিমল গুরুঙ্গ পাহাড়ে লাগাতার বন্‌ধ করছেন। নানান কারণে বারংবার বাংলা বন্‌ধ ডাকার জন্য যে বিরোধী নেত্রী বিখ্যাত ছিলেন, এখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি বলছেন, পাহাড়ে আন্দোলনকারীদের 'ল্যাজ কেটে' দেবেন।

'পাহাড় হাসছে' শ্লোগানের আড়ালে পাহাড়ের সমস্যাগুলি আড়াল করে রাখতে চেয়েছিল বর্তমান সরকার। এখন আন্দোলনের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের মতো আদ্যন্ত রাজনৈতিক একটি প্রশ্নকে 'আইনশৃঙ্খলা'র তুচ্ছতায় পর্যবসিত করে পাহাড়ের মানুষদের ওপর দীর্ঘদিনের অবদমনের প্রক্রিয়াটি চালিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর এই রাজ্য সরকার। রাজনৈতিক প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধানের অক্ষমতা, পাহাড়ের ভূমিপুত্রদের পক্ষে মর্যাদাহানিকর উক্তি ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সরকার আন্দোলনকারীদের আস্থা পুরোপুরি হারিয়েছে। তাই শাসকদের চিরাচরিত সন্ত্রাসের হাতিয়ার ছাড়া তাদের হাতে আর কিছু নেই। পাহাড়ে তীব্র সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি পুলিশি হানা, ব্যাপক গ্রেপ্তার চলছে। বস্তুত, মানুষকে সন্ত্রস্ত করতে এত বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সমাবেশ ইঙ্গিত দিচ্ছে জনসমর্থনের পাল্লা কোন্ দিকে।

ভাযাগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতি ঐতিহ্যে ভরপুর এই দেশে নানা ভাবে অবদমিত মানুষদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের চাহিদা প্রবল। স্বাধীন ভারতের ৬৬ বছরের ইতিহাস তাদের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ও প্রত্যুত্তরে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের ইতিহাস। তবে এটাও ঠিক যে, মতাদর্শগত দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্থ ও ক্ষমতালোভী কিছু গোষ্ঠী এই ন্যায্য আন্দোলনগুলিকে বারবার কব্জা করে নিচ্ছে। জনগণের মুক্তি নয়, বর্তমান শাসকদের সাথে ক্ষমতার ভাগবাঁটোয়ারাতেই তাদের আগ্রহ। ঝাড়খন্ড থেকে ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড থেকে নাগাল্যান্ড— ক্ষমতা লাভের পর স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী সর্বত্রই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ।

আমজনতা রাষ্ট্র এবং 'জনতার প্রতিনিধি'দের শাঁখের করাতের পেষণে নিপীড়িত। আন্দোলনের চরিত্র, রূপ ও অন্যান্য বিষয়ে জনগণের নিয়ন্ত্রণ কমছে এবং আন্দোলনের স্বার্থান্বেষী নেতারা রাষ্ট্রের সঙ্গে রফায় এসে দ্রুত ক্ষমতার ভাগ চাইছে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনেও সাধারণ মানুষের যত না উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে, তার থেকে বেশি চোখে পড়েছে মুষ্টিমেয় মানুষের ধনবৃদ্ধি।

এসব সত্ত্বেও এটা মানতে হবে যে আঞ্চলিক এই শক্তিগুলির উত্থানের পেছনে আছে বিপুল জনসমর্থন, আছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আকাঙ্ক্ষা। তারও পেছনে অবশ্যই আছে শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সত্যি সত্যি নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বারবার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পাচ্ছে। আর রাষ্ট্র ও তার নিয়ন্ত্রকরাও নিত্যনতুন কায়দায় তাকে দমন করতে নামছে— সালমা জুড়ুম থেকে আধাসামরিক বাহিনী, নতুন কালাকানুন থেকে খুনখারাপি— কিছুতেই তারা পিছপা নয়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তার কর্ণধারও সেটাই করছেন। তবে ১৮৫ জন বিধায়ক-গর্বিত মুখ্যমন্ত্রী যদি মানুষের ক্ষোভকে গুরুত্ব দিতে ভুলে যান তার ফল কী হতে পারে, এরাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসই তার সাক্ষী।

মার্কিন শ্রমিকদের আয় কমছে

সবাই জানেন যে মন্দার ফলে মার্কিন দেশে বেকারি বাড়ছে, শ্রমিকদের মজুরিও কমতির দিকে। কিন্তু তার পরিমাণ কতটা? কিছু তথ্য দেওয়া যাক।

সরকারি হিসাবমতো, এবছর জানুয়ারিতে সে দেশে বেকারির হার ছিল ৭.৯ শতাংশ। কিন্তু এ হিসাবের মধ্যে একটা আধা-কারচুপি আছে। যারা আংশিক সময়ের কাজ করছেন বা অনেকদিন ধরে বেকার থাকার পর কাজ খোঁজা ছেড়ে দিয়েছেন তাদের এই হিসেবে ধরা হয় নি। এদের ধরলে পূর্ণ সময়ের কাজ করতে চান কিন্তু পাচ্ছেন না এরকম বেকার সংখ্যা ১৪.৪ শতাংশ। ২.২ কোটি।

এবার আসি মজুরি প্রসঙ্গে। প্রকৃত মজুরি (অর্থাৎ প্রাপ্ত মজুরি থেকে মূলবৃদ্ধি বাদ দিয়ে) কমছে দু-চার দশক নয়— বেশ কয়েক দশক ধরে। তবে তাতে মানুষের জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটে নি। কারণ, এই সময়ে প্রচুর নারী শ্রমিক বাহিনীতে যুক্ত হয়েছেন। পরিবারের নারী-পুরুষ, দুইয়ের আয় যোগ হওয়াতে পারিবারিক আয় কমেনি।

কিন্তু গত দশক থেকে পারিবারিক আয়ও কমতে শুরু করেছে। ২০০০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের পরিবারগুলিতে (শুধু শ্রমিক পরিবার নয়) পারিবারিক আয় কমেছে প্রায় ৯ শতাংশ। অবশ্য মনে রাখতে হবে, আয় কমলেও মার্কিন শ্রমিকদের আয় আমাদের দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে তুলনীয় নয়— অনেকটাই বেশি। কিন্তু প্রকৃত আয় প্রায় ৯ শতাংশ কমে যাওয়ায় এদের জীবনযাত্রায় যথেষ্ট টান পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

একটা জিনিস খুব বেড়েছে। পূর্ণ সময়ের শ্রমিকের বদলে আংশিক সময়ের কাজ। কর্মরত মোট শ্রমিকের এক-পঞ্চমাংশই (২০ শতাংশই) এখন আংশিক সময়ের কাজ করেন। এদের অনেকেরই কাজের নির্দিষ্ট সময়সূচি নেই। মালিকদের যখন দরকার, যতটুকু দরকার, সেইটুকু সময়ের জন্য তারা কাজ পান। কাজের নির্দিষ্ট সময় না থাকায় আর একটি আংশিক সময়ের কাজ জুটিয়ে আয় বাড়ানোও সম্ভব হয় না।

একদিকে পূর্ণ সময়ের শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস, আর অন্যদিকে প্রকৃত মজুর হ্রাস। সব মিলিয়ে মোট আয়ে শ্রমিকের অংশ কমছে, মালিক/পুঁজিপতির অংশ বাড়ছে।

প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ জেমস গলব্রেথ দেখিয়েছেন যে ১৯৫০-এর দশক থেকে ব্যক্তিগত আয়ে মজুরি/বেতনের অংশ কমছে। সম্প্রতি আবার মার্কিন সরকারি সূত্র থেকেই জানা যাচ্ছে যে অর্থনীতিতে শ্রমিকের অংশ ক্রমাগত কমছে— বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বর্তমান দশক পর্যন্ত। এই হিসাবে আবার শুধু বেতন/মজুরি নয়, শ্রমিকদের প্রাপ্ত সমস্ত সুযোগসুবিধাই ধরা হয়েছে।

এর মধ্যে আবার মাথায় রাখতে হবে যে, এই বেতন/মজুরির হিসাব শুধু শ্রমিকদের নয়। এর মধ্যে সুপারভাইজার, ম্যানেজার সবার হিসাব আছে। এইসব ম্যানেজমেন্ট কর্মীদের সংখ্যা ও বেতন কিন্তু ক্রমাগত বাড়ছে— মন্দার কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে। ফলে, শ্রমিকদের মজুরি আসলে আরও বেশি হারে কমছে।

এসবের কারণ কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়। বড় কারণ হলো রাজনৈতিক— শ্রমিকদের শক্তি হ্রাস আর মালিকদের শক্তি বৃদ্ধি। ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট রেগান যখন ধর্মঘটরত এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের ছাঁটাই করে ইউনিয়নহীন শ্রমিকদের নিয়োগ করলেন, তা থেকে এর সূত্রপাত ধরা যেতে পারে। সরকারের দেখানো পথ অনুসরণ করতে বেসরকারি মালিকরাও দেরি করেনি। ধর্মঘট করলে ছাঁটাই করে নতুন শ্রমিক নিয়োগ। ইউনিয়নকে কমজোরি করে দেওয়া। ২০১২ সালে শ্রমিকদের মাত্র ১১.৩ শতাংশ ইউনিয়নভুক্ত— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সর্বনিম্ন। শুধুমাত্র ঐ একটি বছরেই সদস্যসংখ্যা কমেছে ২.৮ শতাংশ। চার দশক ধরে কমেছে ধর্মঘটের সংখ্যা ও ধর্মঘটের ফলে শ্রমদিন হ্রাসের সংখ্যা।

এই সময়ে মালিকদের হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী যে অস্ত্রটি যোগ হয়েছে তার নাম আউটসোর্সিং। শ্রমিকরা বেশি বেগরবাই করলেই কারখানা বন্ধ করে বিদেশ থেকে কাজ করিয়ে নেব— এই ভয় দেখানোতে কাজ হয়েছে ভালোই। কাজ হারানোর ভয়ে শ্রমিকরা সদাই সন্ত্রস্ত।

বেকারির উচ্চ হার, কম মজুরি, এসবের ফলে উৎপাদনের শতাংশ হিসাবে, মোট জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ হিসাবে, সব ভাবেই শ্রমিকদের আয়ের অংশ কমছে। মার্কিন সেন্সাস ব্যুরোর হিসাব অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, আর ৫ কোটি মানুষ বাস করে দারিদ্র্যের দোরগোড়ায়। এই ১০ কোটি মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। আর এসবের ফলে এই মন্দার বাজারেও পুঁজিপতিদের আয় বাড়ছে। আর শুধু মার্কিন শ্রমিকদের মজুরি কমিয়েই তো তাদের আয় বাড়ে না, শোষণ করার জন্য রয়েছে পুরো বিশ্ব।

মিতা দত্ত

তথ্যসূত্র

ক্লাস ওয়ার অ্যান্ড লেবার্স ডিক্লাইনিং শেয়ার, ফ্রেড ম্যাগডফ ও জন বেলামি ফস্টার, মান্থলি রিভিউ, মার্চ ২০১৩

সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচন ও পঞ্চায়েত প্রসঙ্গ

পরিচয় কানুনগো

অঘটন কিছু ঘটেনি। রাইটার্সের পর পঞ্চায়েতও তৃণমূলের দখলে। কিন্তু দু' বছর ক্ষমতায় থাকার পর, জয়লাভ যতটা মসৃণ হওয়ার কথা ছিল, ততটা সহজ জয় হয়নি। সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোটে জেতার জন্য, রাজনৈতিক দলগুলি যা যা অস্ত্র ব্যবহার করে, অর্থাৎ বুথ দখল, সন্ত্রাস, ছাপ্পা ভোট, ব্যালট ছিনতাই— তার কোনটাই শাসক দল ব্যবহার করতে কসুর করেনি। এমনকি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে চোখ রাঙিয়ে, নিজেদের মর্জিমতো ভোট করার চ্যালেঞ্জ নিতেও তৃণমূল সরকার পিছপা হয়নি। শেষ পর্যন্ত সরকার নয়, কমিশন নয়, নির্বাচনের নির্ঘণ্ট তৈরি করলো সুপ্রিম কোর্ট। এ ধরনের ঘটনা সম্ভবত এদেশে বেনজির। সত্যি ''কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়''। শীর্ষ আদালতের আদেশে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী যদিও বা পশ্চিমবঙ্গে পা রাখলো, নির্বাচনের সময়ে স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলিতে তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না— কিছুটা নিয়মের গেরোয় আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রকৌশলে। ফলত পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে উঠেছিল বেপরোয়া বাইক বাহিনীর ভৈরব নৃত্যের উন্মুক্ত মঞ্চ।

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলির অবশ্য সান্ত্বনা পাওয়ার বিশেষ জায়গা আছে বলে মনে হয়না। রিগিং না হলে চিত্রটা যে আমূল পাল্টে যেত, এমন ভাবনার কোন অবকাশ নেই। ভোট-সন্ত্রাস সারা দেশেই এক সাধারণ ঘটনা। ভারতীয় গণতন্ত্রের বয়স যত বাড়ছে, তার পলেস্তারা-খসা আদত চেহারাটা ততই প্রকট হয়ে পড়ছে। '৭২-এর সিদ্ধার্থ ব্র্যান্ডের ভোট বর্তমান প্রজন্ম প্রত্যক্ষ করেনি কিন্তু বিগত বামফ্রন্ট শাসনে, তারা সিপিএম ব্র্যান্ডের ভোট দেখেছে। সুতরাং নির্বাচনী রাজনীতিটা তাদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এখন তৃণমূলের পাটকেল খেয়ে সিপিএম কবুল করছে, 'তখনও এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা এখনও ঘটছে'। কবুল করে কী হারানো জমি উদ্ধার করা যায়? এই নির্বাচনী সন্ত্রাসের মধ্যেই মানুষ ভোট দিয়েছে, নিজস্ব মত প্রদানের চেষ্টা করেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই বিচার করা হয় মানুষের মতামত।

নির্বাচন চিত্র

৩১ জুলাই তারিখে সংবাদপত্রে পঞ্চায়েত নির্বাচনের যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তার বিচারে রাজনৈতিক দলগুলির আসনপ্রাপ্তি নিম্নরূপ (শতাংশে):

দল	জেলা পরিষদ	পঞ্চায়েত সমিতি	গ্রাম পঞ্চায়েত
টিএমসি	৬৩.০৯	৫৬.৪০	৫০.১৬
বামফ্রন্ট	২৬.৯৫	৩১.৩০	৩২.৬২
কংগ্রেস	৯.৫৬	১০.৪১	১১.৭২
অন্যান্য	০.৩৯	১.৮৮	৫.৫০

তিন স্তর মিলিয়ে ৫৮৮৬৫ আসনের মধ্যে ৬২৭৪টি আসনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলনা। ভোটের আগেই তৃণমূল ''বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়''একাই দখল করেছিল ৬০০০-এর বেশি অর্থাৎ ১০ শতাংশ আসন। দখলটা সেখানেই বেশি হয়েছে, যেখানে আগের নির্বাচনগুলিতে সিপিএম তাদের দখলদারি কায়েম করতো। হুগলিতে ১৪৩০টি আসনে ভোট হয়নি। এছাড়া দুই মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া— এসব জেলাতেও ভোট-সন্ত্রাসে ব্যাপক আসনে ভোট হয়নি। তবে ২০০৩ সালে 'উন্নত বামফ্রন্টের' শাসনাধীনে ৬৮০০ আসনে ''বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়'' নির্বাচন এখনও পর্যন্ত সম্ভবত রেকর্ড। এর ৯০ শতাংশ গিয়েছিল একা সি পিএম-এর পকেটে। বামফ্রন্টের অন্যান্যরাও যথাযথ ভাগ পেয়েছিল। সবই ঠিক আছে। কেবল ইতিহাসের চাকাটা ঘুরে গেছে।

এবারের নির্বাচনে পাঁচটি জেলায় শাসকদল সুবিধা করতে পারেনি। জলপাইগুড়ি, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ জেলাতে তৃণমূল তৃতীয় স্থানাধিকারী। নদীয়া জেলাতে জিতেছে, তবে বেশ কষ্টেসৃষ্টে। বামফ্রন্ট একক শক্তিতে জেলা পরিষদ গঠন করতে পারবে জলপাইগুড়ি জেলাতে। তৃণমূল-কংগ্রেসে বোঝাপড়া না হলে অথবা বামফ্রন্ট-কংগ্রেসে বোঝাপড়া হলে, উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও বামফ্রন্ট বোর্ড গঠন করতে পারে। এসব পর্দার পিছনের খেলাতে আমজনতার কোন ভূমিকা নেই।

গত দু'বছরে মমতা-শাসনের যে বৈশিষ্ট্য বারে বারে চেখে পড়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যাবতীয় সাংবিধানিক-অধিকার রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এবং গণতান্ত্রিক ফোরামগুলিকে অকেজো করে দেওয়া, উপেক্ষা করা কিংবা কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা তৃণমূল শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রেও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তৃণমূল সরকারের যে বিরোধ, তাতে একটা বিষয়ই পরিস্ফুট হয়েছে যে, এই সরকার একনায়কতন্ত্রী। এই সরকারের কর্মপদ্ধতিতে নিয়মতান্ত্রিকতার তুলনায় স্বেচ্ছাচার প্রধান। যাবতীয় ব্যক্তি-অধিকার, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, প্রশাসনিক নিয়মশৃঙ্খলা ব্যক্তির আজ্ঞাধীন। বামফ্রন্টের দলতন্ত্র পরিণত হয়েছে তৃণমূলী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায়। সেই কারণে বিশৃঙ্খলাও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি।

পঞ্চায়েতের ভবিষ্যৎ

এত কাণ্ড করে যে পঞ্চায়েত দখল হলো, তার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা অনুমান করা শক্ত। বর্তমান সরকারের দুবছরের শাসনে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রতি খুব একটা ভক্তিশ্রদ্ধা দেখা যায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাবেক প্রশাসনের উপর নির্ভর করতেই

বেশি পছন্দ করেন। এর একটা বড়ো কারণ হলো, সিপিএম বা অন্যান্য বামদলগুলি যে সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরে নিম্নতম স্তরে দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পেরেছিল, তৃণমূলের সে পারদর্শিতা নেই। সুতরাং ডিএম/এসডিও-দের অঙ্গুলি নির্দেশে যে পঞ্চায়েত চলবে, তারও স্বাধীনতা কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে, সে ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ আছে।

দ্বিতীয়ত, একটা প্রশ্ন সততই প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে পঞ্চায়েত কি আদৌ কোন গুরুত্ব পায় বা শাসকশ্রেণী উন্নয়ন প্রশ্নে পঞ্চায়েতকে কি প্রকৃত গুরুত্ব দেয়? বিশেষত আধুনিক বিশ্বায়ন প্রভাবিত নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির যুগে পঞ্চায়েত কি প্রকৃতই কোন ভূমিকা নিতে পারছে?

পঞ্চায়েতের ভূমিকা

ভারতের সংবিধানে পঞ্চায়েতকে 'স্বায়ত্তশাসনের এককরূপে' গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে (৪০ নং অনুচ্ছেদ)। গ্রামীণ এলাকার মানুষ নিজেরা যদি নিজেদের উন্নয়ন ভাবনার শরিক হতে এবং তা কার্যকর করার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখতে পারতেন, তাহলে 'স্বায়ত্তশাসন' শব্দটার অর্থ কিছুটা উপলব্ধি করা যেত। সংবিধানের 'নির্দেশক নীতিতে' কতকগুলি ''ইচ্ছা'' ঘোষণা করাটাই তো সব নয়। ইচ্ছাগুলি রূপায়ণের রাজনৈতিক সদিচ্ছা কোথায়? স্বাধীনতার পর দু দুটি 'মেহতা' কমিটি (বলবন্তরায় মেহতা কমিটি, ১৯৫৭ এবং অশোক মেহতা কমিটি, ১৯৭৮) তাঁদের সুপারিশ পেশ করেছে। তদনুযায়ী ৭৩-তম সংশোধনী (১৯৯৩) মারফত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে পঞ্চায়েতগুলি কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির রূপায়ণকারী এজেন্সি ব্যতীত কার্যত আর কোন ভূমিকাই নিতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিকল্পনা পর্যদের প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত অর্থনীতিবিদ অজিত নারায়ণ বসু বলতেন, ''গ্রামবাসীদের দ্বারা গ্রাম পরিকল্পনা''। উন্নয়ন পরিকল্পনা হবে গ্রাম সংসদ স্তরে। ''গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় আইনসভা পর্যন্ত সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি স্তরেই— এবং যত ওপরে ওঠা যায় তত বেশি বেশি করে— অধিকাংশই প্রত্যক্ষভাবে শ্রমজীবী নয়; মূলত তারা পরশ্রমজীবী। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিটি গ্রাম বা গ্রাম-সংসদের মানুষদের অধিকাংশই হচ্ছে শ্রমজীবী, হয়তো বা পুরোপুরি মজুরই। পুঁজির আধিপত্যের ভিত্তিতে বর্তমান সমাজ যে পথে চলছে, তার উল্টোপথের প্রধান ধারক হতে পারে মজুর এবং অন্যান্য শ্রমজীবীরাই।'' (দেখুন 'আদিম স্বপ্ন ও নতুন পথ'— অজিত নারায়ন বসু)।

বামফ্রন্ট সরকার এদেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম পথপ্রদর্শক, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীবসু উল্লেখিত শ্রেণী ভিত্তির উপর নির্ভর করে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত পরিচালনা করেনি। ''পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েতের মূল কাজ কী? মূল কাজ হচ্ছে কয়েকটা 'উন্নয়ন স্কীম' চালু করা, যার প্রায় সবটাই স্থির করেছে কেন্দ্রীয় সরকার বা আন্তর্জাতিক কোন ক্ষমতা কেন্দ্র''— অনেক আক্ষেপ করে শ্রী বসু কথাগুলো বলেছিলেন। ১৯৯২ সালে বামফ্রন্ট সরকার নিয়োজিত কমিটিই বলছে, ''শুরুতে জনগণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি উভয়ের মধ্যেই প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। ১৯৮৩ সালের পর, দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর প্রাথমিক উদ্দীপনা প্রশমিত হতে শুরু করে। ১৯৮৮ সালে তৃতীয় পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার পর, মনে হয়, সমস্তটাই উপে গিয়েছিল। প্রথম দিকের উদ্ভাবনী মানসিকতার কদাচিৎ দেখা মিলতো। পঞ্চায়েতগুলি দৈনন্দিন কাজেই ডুবে থাকতো। ...এই নেতিবাচক দিকটাই আমাদের মধ্যে প্রশ্নের উদ্রেক করলো, কেন পঞ্চায়েতগুলি উৎসাহ হারাচ্ছে।... আমরা দেখলাম, বোধের দিক থেকে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেতৃত্বের পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদনে ভারাক্রান্ত অনেকের ধারণা, পঞ্চায়েত হলো উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া স্কীমগুলি রূপায়ণের এজেন্সি মাত্র। পঞ্চায়েত যে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান, এই বোধ হয় অনুপস্থিত নতুবা আবছা ধারণা আছে মাত্র''। (Ref: New Horizons for West Bengal's Panchyats— N Mukarjee and D Bandopadhya)

পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করে শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণীগত অধিকার আদায় এবং আধিপত্য বিস্তারের যে ভাবনা শ্রী অজিত নারায়ন বসু ভেবেছিলেন, সিপিএম সেই ভাবনার শরিক না হয়ে, গ্রামীণ মানুষকে শুধুমাত্র অনুদানের বশে রেখে কেবলমাত্র দলগত ক্ষমতা বিস্তারের হাতিয়ার করেছিল, তার একমাত্র কারণ, মুখে সমাজবিপ্লবের কথা বললেও, সিপিএম শ্রেণী সংগ্রামের পথ পরিহার করেছিল। কার্যত তাদের অভিপ্রায় ছিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে আপস করে রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদারিত্ব। বুর্জোয়া সংস্কারগুলি করতে তারা উদ্যোগ নিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে নয়, আর একটি সংসদীয় বুর্জোয়া দল হিসাবে।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী কাজকর্ম

গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের শ্রম মূলত জমি নির্ভর। কৃষি জমি, জলা জমি, চারণ ভূমি বা অরণ্য ভূমি— কোন না কোন ভূমি সম্পদকে ভিত্তি করেই গ্রামের মানুষ বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করে। পঞ্চায়েতের কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু তাই হওয়া উচিত ছিল ভূমি সংস্কার, যা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভোট কেনার কৌশল। ভূ-সম্পদ যথাযথ ব্যবহার বিষয় পঞ্চায়েতের কোন ধারণা ছিল বলে মনে হয়না। বামফ্রন্ট সরকার একটা সময়ে সরকারে ন্যস্ত অকৃষি জমি পঞ্চায়েতের জিম্মায় দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত সেগুলি সঠিক ভাবে ব্যবহার না করতে পারার জন্য, সরকার আবার জমিগুলি ফেরত নিয়ে নেয়। সরকারি জলা জমিগুলি মৎস্যজীবীদের সমবায় গঠন করে ব্যবহার করার পরিকল্পনা, পঞ্চায়েতগুলির অনাগ্রহ এবং বিরোধিতার কারণে মুখ থুবড়ে পড়ে। বাস্তবত জলা জমিগুলি লুঠ হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা বিলিবণ্টন ছাড়া, পঞ্চায়েতগুলি আর কোন কিছুতে মনোযোগ দিয়েছিল বলে মনে হয় না।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ শ্রমনির্ভর প্রকল্প হলো 'জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্প'। ২০১০-১১ সালের (বামফ্রন্ট সরকার) সরকারি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এই প্রকল্পে জব কার্ড পেয়েছিলেন ১.১১ কোটি পরিবার। কর্মসংস্থান হয়েছিল ৫৩.১৯ লক্ষ পরিবারের। প্রতি পরিবার কাজ পেয়েছিলেন গড়ে ২৭ দিন। ১০০ দিনের কাজ পেয়েছিলেন মাত্র ২.৫ শতাংশ পরিবার। ২০১২-১৩ সালের (তৃণমূল সরকার) ক্রমপুঞ্জিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে— জব কার্ড প্রাপ্তির সংখ্যা ১.১৪ কোটি, কর্মসংস্থান ৫৮.১২ লক্ষ, গড়ে কাজ পাওয়া গিয়েছিল ৩৫ দিন এবং ১০০ দিন কাজ জুটেছিল ৪ শতাংশ পরিবারের। বামফ্রন্টের শেষ বেলায় কাজকর্মের তুলনায় এক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার পরিমাণগত বিচারে কিছুটা উপরে অবস্থান করছে ঠিকই। কিন্তু মানের বিচারে দুই সরকারেরই অবস্থান প্রায় একই বিন্দুতে। সারা ভারতে পরিবার পিছু কাজের দিন সৃষ্টির ব্যাপারে সর্বোচ্চ অবস্থানে আছে ত্রিপুরা (৮৪ দিন)। জাতীয় গড় ৪৪ দিন। কোন্ বিচারে পশ্চিমবঙ্গকে মুখ্যমন্ত্রী এক নম্বরে নিয়ে গেলেন, তা কেউ বুঝিয়ে দিলে উপকার হয়।

বনাধিকার আইনে গ্রাম সভার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হলেও বামফ্রন্ট সরকারের সময় থেকেই গ্রাম সভা উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। বামফ্রন্টের সময় এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত ১৩৭২৭৮টি আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু অনুমোদিত হয়েছিল মাত্র ২৯৯৬৫। ৩০ জুন ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত, নতুন কোন আবেদন জমা পড়েনি। বিগত দুই বছরে নিষ্পত্তি হয়েছে আর মাত্র ২৮৫৬টি আবেদন। বামফ্রন্টের সময় খারিজ হয়েছিল ৭৯৪৫৭টি আবেদন। অর্থাৎ মাত্র ২২ শতাংশ গ্রাহ্য হয়েছিল এবং ৫৮ শতাংশ খারিজ করা হয়েছিল। তৃণমূল সরকারের শাসনে অনুপাতটা উন্নত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা।

এখন বিশ্বায়িত নয়া উদারনীতির যুগে, জমি প্রোমোটার-ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হচ্ছে। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়নের এজেন্সি দিয়েছিল কর্পোরেট সংস্থাকে। বর্তমান তৃণমূল সরকারও উন্নয়নের দায়-দায়িত্ব সঁপে দিতে চাইছে সেই কর্পোরেট শিল্পের হাতেই। তবে কৌশলটা ভিন্ন। পুরোনো সবকিছুই থাকবে, শুধু নামটা বদল হয়ে যাবে। ভিন্ন নামে *সেজ* থাকবে, সিলিং অতিরিক্ত জমি রাখার ক্ষেত্রেও ছাড় মিলবে। একমাত্র অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেই তৃণমূল নেত্রী কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে একমত হতে পারছেন না। তবে পথ খুঁজছেন। এখানে পঞ্চায়েতের ভূমিকা কোথায়?

কাদের হাতে পঞ্চায়েত?

পঞ্চায়েতের সদস্য বিন্যাসেও অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯৯৩ সালে সরকারি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, পঞ্চায়েতগুলির শীর্ষস্থান মূলত অ-শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের দখলে চলে গেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শ্রমজীবী মানুষের ঘনত্ব সামান্য বেশি হলেও, উপরের দুইটি স্তরে অ-শ্রমজীবীদের আধিপত্যই বেশি।

পঞ্চায়েতের সদস্য বিন্যাস (শতাংশ)

পেশা	গ্রাম পঞ্চায়েত ১৯৯৩*	১৯৭৮-৭৯**	পঃ সমিতি ১৯৯৩*	জিঃ পরিষদ ১৯৯৩*
কৃষিমজুর	১৩.৫	৪.৮	৭.৭	২.৮
বর্গাদার	৩.৩	১.৮	২.৮	২.৫
মালিক কৃষক	২৩.৯	৫০.৭	২০.১	৭.৩
পশুপালক	১.০	-	০.৭	০
মৎস্যজীবী	০.৮	০.৪	-	-
গ্রামীণ কারিগর	২.৬	১.৬	২.১	১.১
কৃষক ও শ্রমজীবী	**৪৪.১**	**৫৯.৩**	**৩৩.৪**	**১৩.৭**
দোকানদার	২.৮	১.৪	২.৫	০.৪
অন্যান্য ব্যবসাদার	৫.৩	-	৪.২	৩.৮
শিক্ষক	৬.৭	১৪.০	১৫.৫	৩২.৫
ছাত্র	০.৮	০.৬	১.১	১.৮
বেকার	১৮.৩	৭.৫	২৩.৩	২৩.১
ডাক্তার	-	১.১	-	-
অন্যান্য বৃত্তি	৪.৮	-	৫.৭	৬.৩
অন্যান্য	১৫.৫	১৬.১	১৪.০	১৮.৫
বুদ্ধিজীবী/অন্যান্য	**৫৪.২**	**৪০.৭**	**৬৬.০**	**৮৬.৪**

উৎস- *মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪

**সূর্যকান্ত মিশ্র- শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীতে পঞ্চায়েত

জেলা পরিষদ, যাদের হাতে মূলত পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, সেখানে পুরোপুরি অ-কৃষক এবং অ-শ্রমজীবী শ্রেণীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য। নীচের স্তরেও এই সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য। আধুনিক বিশ্বায়িত নয়া উদারনৈতিক উন্নয়নে যে শ্রেণী সবথেকে সুবিধাভোগী, সেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি পঞ্চায়েতকে পরিণত করেছে বিশ্বায়নের উপাঙ্গে।

নবগঠিত পঞ্চায়েত গ্রামীণ অর্থনীতিতে কতদূর পরিবর্তন আনবে, এখনই বলার সময় আসেনি। তবে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির যা পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয়, গ্রামীণ মানুষের স্ব-উদ্যোগকে তাঁরা 'সেল্ফ হেল্প গ্রুপের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন। তার বাইরে প্রসারিত হতে দেবেন না। পশ্চিমবঙ্গে না দেখলেও আমরা পস্কো-বিরোধী আন্দোলনে গ্রামসভাগুলির সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছি। নিয়মগিরিতেও বেদান্ত-বিরোধী আন্দোলনে গ্রামসভা যে ভূমিকা নিয়েছে, তা সারা দেশের কাছেই শিক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গের বুকেও যে নতুন করে আক্রমণ নামবে না, তার কোন গ্যারান্টি আছে কি? মানুষকে যদি বাঁচতে হয় তো প্রতিরোধের মাধ্যমেই বাঁচতে হবে। আর সেই প্রতিরোধে পঞ্চায়েতের, বিশেষত গ্রামসভার, এক নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। এমনকি দুর্বৃত্তদের উৎপাত আটকাতেও প্রয়োজন গ্রামসভা স্তরে ঐক্যবদ্ধ এবং সংগঠিত প্রতিরোধ।

ঘটনাপ্রবাহ

ক্ষুধাকে বাজি রেখে বাড়ছে মিলিটারি ব্যয়

শ্যামল দাস

২০১৩-১৪ অর্থব্যয়ের অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ (Expenditure Budget) অনুযায়ী প্রতিরক্ষা ব্যয় ধরা হয়েছে ২,৫৩,৩৪৫ কোটি টাকা। এটা বর্তমান অর্থব্যয়ের অনুমোদিত মোট ব্যয়-বরাদ্দের ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ব্যয় এবং পারমাণবিক ও মহাকাশ দপ্তরের ব্যয়ের ৫০ শতাংশ প্রতিরক্ষা ব্যয়ের সাথে যোগ করা হয় তবে মিলিত ব্যয় হবে ৩,১৩,৯২১.৯১ কোটি টাকা। এ বছর ভারতের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬,৩৫,২৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থব্যয়ের মোট ব্যয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সামরিক খাতে ব্যয়।

বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার জন্য এবারে প্রতিরক্ষা বাজেটে ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৬,৭৪০ কোটি টাকা। এই খাতে ধার্য টাকার পরিমাণ বছর বছর বেড়েই চলেছে। যদিও টাকার জোগানের অভাবে বাজেট বরাদ্দ ও সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের (revised estimate) ফারাক বেড়েই চলেছে। যেমন ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে এই খাতে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৭৯,৬০০ কোটি টাকা। আর সংশোধিত বাজেটে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আমদানিকৃত অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৬৯,৬০০ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবর্ষে বিদেশি অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহকারীকে দেওয়া হয়েছিল ১৮,০০০ কোটি টাকা। যদিও আসল অঙ্কটি হচ্ছে ৬৭,০০০ কোটি টাকা। কেন এই পার্থক্য? একটু পরেই তা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে স্থলবাহিনী, নৌ ও বিমান বাহিনীর বেতন ও ভাতা বাবদ ধরা হয়েছে ৬৩,০৩৭ কোটি টাকা। এর সাথে প্রতিরক্ষা কর্মীদের পেনশন বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৪,৫০০ কোটি টাকা। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম কেনার জন্য ব্যয় ও প্রতিরক্ষা (স্থল, নৌ ও বায়ুসেনা) কর্মীদের বেতন ও ভাতা এবং পেনশনের জন্য ব্যয় যোগ করলেই ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা বাজেটে ধার্য ৩,১৩,৯২১.২১ কোটি টাকার ৬৫ শতাংশ ব্যয়িত হয়ে যাবার কথা। সঠিক তথ্যে পৌঁছানোর জন্য আরও কাটা-ছেঁড়া জরুরি। একথা বলাই বাহুল্য যে, স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামের জন্য প্রধানত বিদেশের ওপর বা আমেরিকা সহ পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল।

উদার অর্থনীতির জমানায় ২০০১ সালে প্রতিরক্ষা শিল্পে ২৬ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ সহ ব্যক্তি-পুঁজি ও করপোরেট-পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ২৮ মার্চ ২০১২ রাজ্যসভায় প্রতিরক্ষা দপ্তর কর্তৃক অস্ত্র ক্রয়-সংগ্রহ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি ছিল এরকম— কেন দেশজ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি অস্ত্র সরবরাহের মাত্র ১৫ শতাংশের অংশীদার এবং বিদেশী কোম্পানিগুলি ৭০ শতাংশের অংশীদার? উত্তরে সরকার পক্ষ তথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানায়, দেশীয় সংস্থাগুলি থেকেই প্রতিরক্ষা সামগ্রীর ৬৫-৭০ শতাংশ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু এই উত্তর থেকে সবটা বোঝা যাবে না। অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড (ওএফবি) ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাগুলি অস্ত্র বা যুদ্ধ-সরঞ্জাম নির্মাণের জন্য বিদেশে থেকে যন্ত্রাংশ ও নক্সা আমদানি করে। এমনকি অস্ত্র নির্মাণের যন্ত্রপাতিও আমদানিকৃত। এ বাবদ রয়ালটি দিতে হয় বিদেশি কোম্পানিগুলিকে। আমদানির জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বা রয়ালটির মূল্য বাবদ খরচ কখনই হিসেবে প্রতিফলিত হয় না। তাই রাজ্যসভায় দেওয়া উত্তর থেকে বাস্তবের ফারাক অনেকটাই।

আগামী ১০ বছরে ভারত বিদেশ থেকে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম কিনতে ব্যয় করবে ৭,৫০,০০০ কোটি টাকা। তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। ছয়টি *লকহিড সি-১৩০ জে সুপার হারকিউলিস* পরিবহন বিমান কেনা হবে। যার দাম ৬০০০ কোটি টাকা। ১২৬টি *র‍্যাফায়েল* বহুমুখী যুদ্ধবিমান কেনা হবে। যার দাম ১,১০,০০০ কোটি টাকা। ৩১০টি রাশিয়ান টি-৯০ ট্যাঙ্ক যার দাম ৪০০০ কোটি টাকা। ১০,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের ৮টি *বোয়িং সুপার হান্টার* বিমান। ২৫০ থেকে ৩০০টি *সুখয়ি টি-৫০* যুদ্ধবিমান কিনতে খরচ ধরা হয়েছে ১,৫০,০০০ কোটি টাকা। ২৯,০০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে ১০টি *বোয়িং সি-১৭ গ্লোবমাস্টার-III* বিমান কিনতে। যুদ্ধজাহাজ *আইএনএস বিক্রমাদিত্যের* আধুনিকীকরণের খরচ ধরা হয়েছে ১১,৫০০ কোটি টাকা। এছাড়াও ৩০০০ আরটিলারি বন্দুক কেনার জন্য ব্যয় হবে ২০,০০০ কোটি টাকা। আরও আছে। ৭৫টি *পিলাটাস* ট্রেনার বিমানের জন্য ৫০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত হেলিকপ্টারের জন্য রাখা আছে ১০,০০০ কোটি টাকা। আকাশে জ্বালানি ভরতে সক্ষম এমন ৬টি যুদ্ধবিমানের জন্য খরচ হবে ৫০০০ কোটি টাকা। এছাড়াও আগাম তথ্য সংগ্রহ ও নজরদারির (reconnaissance and surveilance) জন্য ব্যবহৃত ১৯৭টি হেলিকপ্টার কিনতে খরচা হবে ৩২৫০ কোটি টাকা। এখানেই শেষ নয়। রাইফেল, ১ কিমি পাল্লা-সম্পন্ন স্নাইপার রাইফেল, কারবাইন, হাল্কা মেশিনগান ইত্যাদিও কেনা হবে। অবশ্যই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। অধিকাংশ সামগ্রী কেনা হবে বিদেশি করপোরেশন-গুলির কাছ থেকে। আর দাম দিতে হবে ডলারে। ডলারের দাম

বাড়ার সাথে দামও বাড়বে। আর কারিগরি ব্যাপারে পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকতে হবে সরবহারকারী সংস্থাটির কাছে। ফলে যাকে বলে ল্যাজে খেলাবার সম্ভাবনা প্রবল। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন নৌসেনা-প্রধান অরুণ প্রকাশের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে প্রতিটি আমদানির অর্থ হচ্ছে— "আমরা বিক্রেতাদের কাছে আগামী ৩০-৪০ বছরের জন্য নির্ভরশীল হয়ে থাকব" ("We are at the mercy of the seller nation for 30-40 years thereafter", T01, 14.3.2013)।

ভারতবর্ষ অস্ত্র আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে পয়লা নম্বরে। দুনিয়ার মোট অস্ত্র আমদানির মধ্যে ভারতের ভাগ ১২ শতাংশ। অথচ মানব উন্নয়নসূচকে বহু ক্ষেত্রেই ভারতের অবস্থান সাব-সাহারান দেশগুলির কাছাকাছি বা অনেক ক্ষেত্রে আরও খারাপ। নিজের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রের ১০ শতাংশ আমদানি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ৩০ শতাংশ, আর ভারত আমদানি করে ৭০ শতাংশ। এর সাথে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের আমদানি যুক্ত করা হলে এই পরিমাণ আরও বাড়বে। অস্ত্র আমদানি চুক্তির সাথে জড়িয়ে ঘুষ-কিকব্যাক-কাটমানির প্রশ্ন। নেতা-মন্ত্রী-আমলা-প্রতিরক্ষা আধিকারিক-করপোরেট জগত থেকে শুরু করে মিডিয়া পর্যন্ত এই চক্রের সাথে জড়িত।

১৯৪৭-এর 'মধ্য রাতের স্বাধীনতা'র পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে পড়শিদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে সাকুল্যে পাঁচ বার। ১৯৪৯, ১৯৬২, ১৯৬৫, ১৯৭১ আর সর্বশেষ ১৯৯৯-এ কার্গিল যুদ্ধ। এই যুদ্ধগুলির জন্য ভারত সরকার দায়ী না পাকিস্থান-চীন সরকার দায়ী— সে সব বিতর্কের বিষয়। আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ও জম্মু-কাশ্মীরে (সীমান্তে নয়) অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে ৩০-৪০ বছর ধরে। ১৯৮৪ সালে স্বর্ণ-মন্দিরে কামান নিয়ে ভারতীয় বাহিনীর হামলার কথা আমরা নিশ্চয় এখনও ভুলে যাইনি। ভারতীয় গণতন্ত্রের সেনাবাহিনী তার নিজের নাগরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, হত্যা করেছে। এই যখন অবস্থা তখন অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের জন্য এই হিমালয়-প্রমাণ ব্যয় আসলে কার স্বার্থে? বোয়িং-বফর্স-মিরাজ-সুখই-দাসল্ট প্রভৃতি আমেরিকান বা পশ্চিম ইউরোপীয় বহুজাতিক আর তাদের দেশীয় এজেন্ট বা তাদের সাথে যুক্ত লগ্নি পুঁজির কারবারিদের স্বার্থে নয় তো?

ভারত সরকার যখন মাহিনা ও ভাতা বাবদ (Non-plan) ব্যয় সংকোচনের রাস্তায় হাঁটছে কর্মী সংকোচনের মাধ্যমে তখন সেনা ও আধাসেনা বাহিনীতে নিয়োগ বাড়ছে। পদাতিক-বায়ু-নৌ সেনার মিলিত কর্মী সংখ্যা বর্তমানে ১৩ লক্ষ। এর সাথে আরও ১০ লক্ষ আধা-সামরিক বাহিনী যোগ করলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ২৩ লক্ষ। সামরিক বাহিনী বাদে মোট কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের এই ৪৭ লক্ষ কর্মচারীদের মাহিনা-ভাতা বাবদ মোট ব্যয়ের অর্ধেকই চলে যায় সামরিক-আধা সামরিক বাহিনীর মাহিনা-ভাতা মেটাতে। কীভাবে আধা-সামরিক বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ২০১২ সালে আধা-সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন ৮,৭০,০০০ কর্মী। ২০১৩ সালে তা বাড়িয়ে ১০ লাখ করা হচ্ছে। ১৯৬২ সালে ইন্দো-টিবেট সীমা-পুলিশে কর্মরত ছিলেন ১৫০০ জওয়ান। ২০১২ সালে তা বেড়ে ৭৭,০০০ হয়েছে। ২০১৫ সালে এই সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ৮৯,০০০ করার কথা। আর এর ফল হচ্ছে স্থল-বিমান-নৌ বাহিনী এবং আধা-সামরিক বাহিনীর জন্য মাহিনা-ভাতা ও পেনশন বাবদ মোট ব্যয় ১,৫০,৭৩৪ কোটি টাকা।

আমরা জানি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩ এবং ৪ নং কর্‌প নিয়োজিত আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। সর্ববৃহৎ ১৬ নং কর্‌প নিয়োজিত আছে জম্মু-কাশ্মীরে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে। অন্যদিকে আধা-সামরিক বাহিনীর ৮০ শতাংশ নিয়োজিত আছে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার কাজে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের ৮৫টি ব্যাটেলিয়ান নিয়োজিত আছে মাওবাদী দমনের নামে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড় প্রভৃতি রাজ্যে। ৬২টি ব্যাটেলিয়ান (সিআরপিএফ) আছে জম্মু ও কাশ্মীরে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় রাইফেল্‌স্ আছে জম্মু-কাশ্মীরে আর কোবরা ব্যাটেলিয়ান আছে মাওবাদী অধ্যুষিত মধ্য-ভারতে। অর্থাৎ ভারতীয় গণতন্ত্র তার সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর একটা বড় অংশ নিয়োজিত রেখেছে তার সন্তানদের দমন ও হত্যা করতে। কেন তার সন্তানরা বিদ্রোহী হয়ে পড়ল বা ভারতীয় গণতন্ত্র তার নাগরিকদের একটি অংশকে কেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হল— তার কারণ অনুসন্ধান না করে সামরিক বা আধা-সামরিক বাহিনী নামিয়ে হত্যা-সন্ত্রাস-ধর্ষণ-লুঠ-অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে দমনের রাস্তা নেওয়াটাই একমাত্র দস্তুর বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। আর এই কাণ্ডে তাদের অন্যতম হাতিয়ার সেনাবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন (AFSPA)। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই আইন টিকিয়ে রাখা হয়েছে ভারতীয় গণতন্ত্রের সুরক্ষা ও স্থায়িত্বের নামে।

ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বা ডিআরডিও নামে একটি সংস্থা আছে। যার কাজ অস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণা ও আয়ুধ সামগ্রীর উন্নয়ন সাধন। সিএজি রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি পিনাকা নামের একটি মাল্টি ব্যারেল রকেট লঞ্চার তৈরির প্রকল্প অনুমোদিত হয় ১৯৮৬ সালে। ১৯৯৬ সালে এটি সেনা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকল্পটি আড়াই দশক দেরিতে চলছে। সেনাবাহিনী ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ৪৭৫২টি রকেটের বরাত দিয়েছিল ডিআরডিও-কে। কিন্তু ২০১১ মার্চ পর্যন্ত তারা জোগান দিতে

পেরেছে ১৫৬১টি। যার মধ্যে আবার ৪০৭টি রকেট "আনসারভিশেবল্"।

আয়ুধ ফ্যাক্টরি বোর্ডের (FOB) অধীনে মোট ৩৯টি ফ্যাক্টরি আছে। যেখানে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। ২০১০-১১ সালে এখানে কর্মরত ছিলেন ৯৪,৯১৪ জন কর্মী। যা আবার ২০০৬-০৭ সালে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যার ১২ শতাংশ কম। ২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১, এই চার বছরে ৮৮৭৫ জন শ্রমিক কমেছে। অন্যদিকে একই কাল পর্বে অফিসারদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে, ৩৪৭৭ থেকে ৮৩০৬ জন। অফিসারদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৩৯ শতাংশ। একই কালপর্বে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (target) পূরণের হার কমেছে। ২০০৬-০৭ যেখানে লক্ষমাত্রা ৭৩.৩ শতাংশ পূরিত হয়েছিল, সেখানে ২০১০-১১ সালে পূরিত হয়েছে লক্ষ্যমাত্রার ৬৫.১০ শতাংশ। ২০০৭-০৮ সালে যেখানে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের উৎপাদন ক্ষমতার ৮৪.৯০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছিল সেখানে ২০১০-১১ সালে ববহৃত হয় উৎপাদন ক্ষমতার ৭১.৬৪ শতাংশ।

ওএফবি-র অধীনস্থ কারখানা সংক্রান্ত তথ্যগুলি থেকে একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এটা কোন ঠাণ্ডা মাথার সুদূর প্রসারী চক্রান্ত নয় তো, যার দ্বারা এই সংস্থাগুলির অকর্মণ্যতা প্রমাণিত হবে? আর এই সুযোগে অস্ত্র আমদানির পক্ষে যুক্তি আরো মজবুত করা যাবে। যার দ্বারা লাভবান হবে দেশি-বিদেশি করপোরেট-কূল আর তাদের স্নেহধন্য ঘুষ-কাটমানি-কিকব্যাক-জীবী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ আমলাকুল। এই কারণেই হয়তো কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী প্রতিরক্ষা শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করার পক্ষে ওকালতি করছেন।

"মানুষ যখন চায় বস্ত্র ও খাদ্য/সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাদ্য।" আজকাল মিটিং-মিছিল-জমায়েত এই শ্লোগান আর শোনা যায় না। আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ভারত চারটি যুদ্ধ করেছিল। ১৯৭২ থেকে ২০১২ পর্যন্ত হয়েছে একটি মাত্র যুদ্ধ— ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধ যা বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ জোটকে পরবর্তী পাঁচ বছর ক্ষমতায় রেখেছিল। তাহলে যুদ্ধাস্ত্রের পেছনে, সামরিক সরঞ্জামের পেছনে এই হিমালয় প্রমাণ ব্যয় কেন? দেশি-বিদেশি করপোরেট আর তাদের দোসর লগ্নি পুঁজির কারবারিদের অদৃশ্য হাতের কারসাজি হয়তো ক্রিয়াশীল আমাদের অগোচরে। কারণ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে আইনসভার চেয়ে সিআইআই - ফিকি -অ্যাসোচেম - বিশ্বব্যাঙ্ক - লগ্নিপুঁজির কারবারিদের ভূমিকা অনেক বেশি— অনুসন্ধিৎসু পাঠকের এ কথা জানা আছে। আমরা কি এখনও দেশের গরিবিকে বাজি রেখে প্রতিরক্ষার নামে অস্ত্র কেনার এই ব্যবসাকে প্রশ্নহীনভাবে মেনে নেব?

লেখাটিতে ব্যবহৃত তথ্যগুলি EPW-June 15, 2013-তে প্রকাশিত গৌতম নভলখার লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে

ক্ষুধা বাড়ছে

বিশ্ব জুড়ে ক্ষুধা বাড়ছে। বিশ্বের সমস্ত মানুষকে পেট পুরে খাওয়ানোর মতো খাদ্য উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে ৮৪.২ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। একবিংশ শতকেও প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে বিশ্বে একটি করে শিশু প্রাণ হারাচ্ছে ক্ষুধাজনিত কারণে।

এ বছর যত মানুষ যুদ্ধবিগ্রহে মারা যাবে তার চেয়ে বেশি মানুষ মারা যাবে ক্ষুধার কারণে। কিন্তু ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোথায়? একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, ১৯৯৬ সাল থেকে ক্ষুধা কমেনি, বেড়েছে।

এসব জানিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের জিন জিগলার।

ভূপাল ও ডাও কেমিক্যাল

ভূপালের জেলা আদালতের একটি নতুন রায়ে ভূপালের গ্যাসপীড়িতরা ও তাঁদের স্বার্থে যারা লড়ছেন তাঁরা আশার আলো দেখছেন।

সবাই জানেন, ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানির কারখানা থেকে নির্গত মিক সহ নানা বিষাক্ত গ্যাসে ভূপালের ৫ লক্ষাধিক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন, মারা যান সরকারি হিসাবে প্রায় ৪০০০ জন আর বেসরকারি হিসাবে প্রথম দু সপ্তাহেই মারা যান ৮০০০ জন। অনেকে দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ থেকে শেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সেই বিষ-গ্যাসের দায় বয়ে চলেছে পরবর্তী প্রজন্মও— নানা ধরনের বিকলাঙ্গতা নিয়ে।

কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের দায় নেয়নি ইউনিয়ন কার্বাইড, আদালতের দীর্ঘ মামলা চলাকালীন সেই কোম্পানি কিনে নেয় ডাও কেমিক্যাল। তারা ভূপালের ঘটনার দায় সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। ২৩ জুলাই ভূপালের জেলা আদালত এই সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলায় ডাও কেমিক্যালকে তলব করার নির্দেশ দিয়েছে। ভূপাল নিয়ে আন্দোলনকারীদের মতে, ইউনিয়ন কার্বাইড ও তৎপরবর্তীকালে ডাও কেমিক্যালের দায় এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াবার বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত একটি জরুরি পদক্ষেপ। মনে রাখতে হবে, ইউনিয়ন কার্বাইডের ভারতে কোনো ব্যবসা না থাকলেও ডাও কেমিক্যাল তার বিভিন্ন শাখা কোম্পানির মাধ্যমে ভারতে ব্যবসা করে। ফলে তাদের পক্ষে আদালতের নির্দেশ না মেনে পালানো কঠিন। যদি না সরকার ইউনিয়ন কার্বাইড-এর মতো ডাও কেমিক্যালকে চম্পট দিতে সাহায্য করে।

টাকার পতন

টাকা নিয়ে ভাবনা

জয়তী ঘোষ

গত কয়েক মাস ধরে টাকার দাম পড়ে যাওয়াটা ভারতের অর্থনীতি নিয়ে অনেকের মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতীয় টাকা ডলার পিছু ৬০ টাকার কাছাকাছি চলে এসেছিল। আশংকা করা হচ্ছে যে এটাও সবচেয়ে কম দাম নয়।

টাকার দাম কমলে যারা প্রত্যক্ষভাবে অসুবিধায় পড়বেন— যেমন আমদানিকারীরা বা যারা বিদেশে বেড়াতে যেতে চাইছেন বা বিদেশে শিক্ষার জন্য খরচ করতে চাইছেন— তারা এতে চিন্তিত। কিন্তু টাকার দাম পড়লে আসলে অর্থনীতির প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে এটি সর্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি করে, পাশাপাশি উৎপাদনের বৃদ্ধির হার কমতে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষ খুবই অসুবিধায় পড়ে।

অর্থমন্ত্রক বলছে যে টাকার মানের এই দ্রুত পতন নিয়ে ''প্যানিক করার কারণ নেই''। অর্থমন্ত্রকের প্রতিনিধিরা বলছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের প্রধান বেন বার্নানকে যখন ঋণপত্র কিনে বাজারে ডলার ছাড়ার প্রকল্প বা কোয়ানটিটেটিভ ইজিং, যার ফলে পুঁজি বেশি মুনাফার সন্ধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে অন্য মুদ্রায় সম্পদ সৃষ্টি করছিল— সেই নীতির পরিবর্তন ঘটানোর ইঙ্গিত দিলেন, তার ফলে ডলারের নিরিখে বেশির ভাগ মুদ্রারই পতন ঘটেছে। টাকার পতনও সেই কারণে। এই যুক্তি অনুসারে টাকার ব্যবহার অন্যান্য মুদ্রাগুলির, বিশেষ করে অন্যান্য উদীয়মান বাজারগুলির মতোই— কারণ বিনিয়োগকারীরা তাদের তাজা অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এটা সত্যি নয়। প্রথমত, মার্কিন নীতি যখন একেবারে ঢিলেঢালা ছিল, ব্রাজিলের মতো দেশগুলো যখন অভিযোগ করছিল যে মার্কিন কোয়ান্টেটিভ ইজিং নীতির ফলে মুদ্রা-যুদ্ধ চলছে, তখনও টাকার দাম পড়েছে।

আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, টাকা শুধু মার্কিন ডলারের নিরিখেই পড়ছে না, প্রায় সব প্রধান প্রধান মুদ্রার নিরিখেই পড়ছে। প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটিশ পাউন্ড ও জাপানি ইয়েনের নিরিখে এই পতন সবচেয়ে বেশি। সাম্প্রতিক কালে বেশির ভাগ অন্য উদীয়মান বাজারের মুদ্রার তুলনায় টাকার পতন হয়েছে সবচেয়ে দ্রুত। এশিয়ার প্রধান প্রধান মুদ্রার মধ্যে টাকার পতনই সবচেয়ে বেশি।

গত দু বছর ধরে টাকার যে মধ্যমেয়াদী পতন চলছিল, গত দু মাসে তার হার বেড়েছে। ২০১১ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এই দুই বছরে ডলারের নিরিখে টাকার দাম প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে। বাণিজ্যিক হিসেবে (ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যসঙ্গীদের মুদ্রার নিরিখে) এই পতন তুলনায় কম, কিন্তু তার পরিমাণও ১২ শতাংশ। ভারতে মূল্যবৃদ্ধির হার যেহেতু অন্যান্য অনেক দেশের থেকেই বেশি, প্রকৃত পতনের পরিমাণ মোটামুটি ৭.৫ শতাংশের মতো— কিন্তু সেটাও খুব কম নয়।

ঘাটতি বাড়ছে

দেশের বাইরে টাকার দামের এই পতনের ব্যাখ্যা কী? অর্থমন্ত্রক যা-ই দাবি করুন না, আন্তর্জাতিক শক্তি বা মার্কিন অর্থসংক্রান্ত নীতি নয়, দেশীয় অর্থনীতির ভ্রান্ত ব্যবস্থাপনাই এর কারণ। প্রকৃতপক্ষে এটা যে আগে কেন ঘটে নি সেটাই আশ্চর্যের। ভারতের বেশির ভাগ বাণিজ্যিক লেনদেন সূচকগুলি অত্যন্ত অস্থির চরিত্রের। বেশ কিছু দিন ধরেই এদেশের অর্থনীতিকে দুর্বল (ভালনারেবল) দেখাচ্ছিল। চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ ঐতিহাসিকভাবে সর্বোচ্চ— জিডিপি-র ৫.৫ শতাংশ। বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ আরো বেশি, জিডিপি-র মোটামুটি ৭ শতাংশ।

তার ওপর, সাম্প্রতিক ইঙ্গিতগুলি থেকে মনে হচ্ছে বাণিজ্য খাতে ও চলতি খাতে ঘাটতি আরো বাড়বে। ২০১২-১৩ সালে রপ্তানি ও আমদানি দুটোই আগের বছরের তুলনায় কমেছে, কিন্তু তাতেও বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে প্রায় ৪ শতাংশ, বা ৭০০ কোটি ডলারের বেশি। ২০১৩ সালের এপ্রিলে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২০১২ সালের এপ্রিলের চেয়ে ২ শতাংশ বেশি, কিন্তু আমদানির পরিমাণ ছিল ১১ শতাংশ বেশি— তেল বাদ দিয়ে ধরলে ১৫ শতাংশ বেশি। সব মিলিয়ে ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে বাণিজ্য ঘাটতি তার আগের বছরের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেড়েছে। (অর্থমন্ত্রক, মান্থলি ইকনমিক রিপোর্ট ফর এপ্রিল ২০১৩)

সোনা আমদানি

রপ্তানি যে বাড়ছে তার একটা বড় কারণ সোনা আমদানি— সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটা দারুণ ফুলেফেঁপে উঠেছে। (জন মেইনার্ড কেইনস যে প্রায় একশো বছর আগে ভারতকে 'দামী ধাতুর বর্জ্যপাত্র' বলেছিলেন সেটা এমনি এমনি নয়) সোনার ওপর আমদানি শুল্ক বাড়াতে সরকার যে এত সময় নিল, আর তার পরও তা আশ্চর্যজনকভাবে এত সামান্য বাড়ালো, কারণ এই ধরনের আমদানি অর্থনীতির পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে, নিট অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি উদ্বৃত্ত কমছে।

কারণ মুনাফা ও সুদ বিদেশে পাঠানো হচ্ছে, চলাচলের জন্য বিভিন্ন পরিষেবার মূল্য দিতে হচ্ছে, বিশ্বে মন্দার ফলে (পুঁজি) আমদানি কমছে। ফলে এই অদৃশ্য উদ্বৃত্ত পণ্য-বাণিজ্যের ঘাটতি সামাল দিতে আরো কম সক্ষম হচ্ছে।

আর এই বিরাট বাণিজ্য ঘাটতি ও চলতি খাতে ঘাটতি দিন দিন আরো বেশি করে সামাল দেওয়া হচ্ছে মুদ্রা আমদানি করে— সমস্যা দেখা দিলেই যে মুদ্রায় দেশ ছেড়ে যাবে। বলা হয় যে পোর্টফোলিও পুঁজি দেশ ত্যাগ করছে টাকার দাম কমার (এবং তার ফলে স্টক মার্কেটের পতনের) ফলে। কিন্তু এটা হতেই পারে, আর ভবিষ্যতে হয়ত হবেও যে বিদেশ থেকে বাণিজ্যিক ঋণ কমে গেল বা ব্যক্তিগত ইকুইটি হিসাবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ কমে গেল।

কিন্তু এর ফলে একটা মুরগি-না-ডিম জাতীয় সমস্যা দেখা দেয়। আমদানি যেহেতু এখন ভারতের অর্থনীতির এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ যে টাকার ন্যূনতম দাম কমলে তাতে মুদ্রাস্ফীতির বিপদ দেখা দেয়। তাই বিনিময়ের দর কমালে তাতে বাণিজ্য খাতে কোনো ভালো ফল পাওয়া যাবে না, কারণ জিনিসের দাম বেড়ে যাবে। আর চলতি খাতের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকলে এদেশের অর্থনীতি নিয়ে লগ্নীকারীদের আশা কমে যাবে, তার ফলে দেশ থেকে আরো বেশি পুঁজি বেরিয়ে যাবে, আর টাকার দাম আরও কমবে।

দেশে তেলের দাম

চলতি খাতে ঘাটতি জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে প্রভাব ফেলে, তার ফলে মানুষ এটা পছন্দ করে না। টাকার পতন বিভিন্ন ভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়, একটা বড়ো কারণ হলো তেল-জাতীয় শক্তি-উৎসের মূল্যবৃদ্ধি। ভুলভাবে তেলের দামের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার পর থেকে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামই নয়, মুদ্রার বিনিময় মূল্যও এদেশের তেলের দাম নির্ধারণ করে। এটা তাই আশ্চর্যের নয় যে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এদেশে তেলের দাম বাড়ে— কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয়বার। তেলের দাম যেহেতু সাধারণ নির্ধারক (ইউনিভার্সাল ডিটারমিনান্ট), অন্য সব জিনিসের উৎপাদন মূল্য ও পরিবহন মূল্য বাড়িয়ে এটি সব জিনিসের দাম সরাসরি বাড়িয়ে দেয়। ফলে আমরা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আর এক দফা মূল্যবৃদ্ধির আশংকা করতে পারি।

অন্য অনেক শিল্পও দিন দিন আমদানি-ঘন হয়ে উঠেছে। এর অর্থ, টাকার দাম কমলেই সেগুলির ওপর খরচ বাড়ার চাপ পড়বে। গাড়ি, দামী জিনিসপত্র ও ইলেকট্রনিক পণ্যের মতো স্থায়ী ভোগ্যপণ্য এবং সাবান ও প্রসাধনসামগ্রীর মতো অস্থায়ী ভোগ্যপণ্য, খুব সম্ভব দুয়েরই দাম বাড়বে। আর, বাড়বে খাদ্যের দাম— এটাই সাম্প্রতিক দাম বাড়ার সবচেয়ে চিন্তার দিক।

আরও আছে। আমদানি-করা পণ্যের দাম বাড়লে রপ্তানি-পণ্যেরও দাম বেড়ে যাবে, তার ফলে টাকার দাম কমার ফলে রপ্তানির ক্ষেত্রে যে আপেক্ষিক সুবিধাটুকু হচ্ছিল সেটাও থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ, গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি ক্ষেত্রগুলি, যেমন রত্ন ও গহনা, গাড়ি, যন্ত্র ও রাসায়নিক— এগুলি খুব আমদানি-নির্ভর, ফলে এগুলির দাম বাড়বে। তার ফলে টাকার দাম কমে গিয়ে রপ্তানি বাজারে এগুলি সস্তা হয়ে গিয়েছিল সেই সুবিধা আর থাকবে না। অবস্থা আরও খারাপ হবে এই কারণে যে বর্তমান বিশ্ব বাণিজের মন্দা অবস্থায় ক্রেতারা বিনিময়ের হার পরিবর্তিত হলে পুরনো চুক্তিও নতুন করে করবে। এমন কি পোষাক শিল্প বা চর্মজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের অনেকেই চায় টাকার দামে চুক্তি করতে। তার ফলে টাকার দাম কমলে তাতে তাদের কোনো ক্ষতি নেই, অথচ দেশীয় উৎপাদকরা পণ্য উৎপাদনে বাড়তি খরচ বহন করতে বাধ্য হন। এর অর্থ, টাকার দাম কমলে রপ্তানিতে কোনো উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হবে না।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে টাকার পতন এদেশের প্রত্যেকের চিন্তার কারণ হওয়া উচিত। এটাই আশ্চর্যের যে যাদের সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত, দেশের অর্থনীতির সেই পরিচালক ও নীতি-নির্ধারকরা এ নিয়ে সবচেয়ে কম চিন্তিত।

ফ্রন্টলাইন, ১২.৭.২০১৩

টাকার পতন

রণজয় ভট্টাচার্য

কথায় আছে, বিশ্বাস করে যার হাত ধরবে, সে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই তোমাকে যেতে হবে। ১৯৯১ সাল থেকে ভারতীয় অর্থনীতি বাজারের হাত ধরেছিল। বিদেশি মুদ্রার বাজারের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে ভারতে যে কোন অন্তর্দেশীয় ব্যবসার জন্য ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাস থেকে খোলাবাজারে বিদেশি মুদ্রা কিনতে হচ্ছে। অর্থাৎ ১৯৯৪ থেকেই ভারতীয় টাকা অন্যান্য দেশের মুদ্রার সঙ্গে মুক্ত বাজারে বিনিময় হচ্ছে। মূলত, বাজার যা চাইবে, টাকার দাম সেটাই হবে আন্তর্জাতিক বাজারে।

সুতরাং টাকার মান কেন এতটা কমলো সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে যে প্রশ্ন সামনে আসবে তা হলো: টাকার বাজারদর আজ এত কম কেন? বাজারের আর দশটি দ্রব্যের মতো টাকার দামও টাকার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। টাকার দাম যখন কম, টাকার যোগানের তুলনায় চাহিদা

নিশ্চয়ই অনেক কম। অন্যভাবে বলতে গেলে টাকার বিনিময়ে আমরা যে বিদেশি মুদ্রা কিনতে চাইছি সেই মুদ্রার চাহিদা যোগানের তুলনায় অনেক বেশি। সাধারণত আমরা টাকার বিনিময়ে ডলার কেনাবেচার কথাই বলে থাকি। সুতরাং যেটা হয়েছে তা হলো যে ভারতে মার্কিন এই মুদ্রার চাহিদা ক্রমশ বেড়েছে এবং যোগান তেমন বাড়েনি। ফলে আজ ডলার অগ্নিমূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০০৭-০৮ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার পরবর্তীকালে দু বছরে ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৪ শতাংশ, যা সেই সময়কার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে ছিল অন্যতম। ২০১১-১২ সালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়িয়েছে ৬.৫ শতাংশ, যা ২০১২-১৩তে আরও কমে হয়েছে ৪.৯৬ শতাংশ। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির হার, আঁটোসাঁটো আর্থিক নীতি, অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা, বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বাতাবরণ ইত্যাদি এর জন্য দায়ী। এই আর্থিক সংকটের সময় ডলারে টাকার দরের পতন আরও জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রাগুলির তুলনায় কোনও একটি দেশের মুদ্রার দরের পতন সবসময় যে সমস্যা সৃষ্টি করে তা নয়। যে সমস্ত দেশগুলি জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ রপ্তানি করে থাকে তাদের কাছে দেশীয় মুদ্রার দরের পতন খুব একটা চিন্তার ব্যাপার নয়, কারণ তা রপ্তানি তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আমাদের দেশ এই দেশগুলির মধ্যে পড়ে না। আমরা যা রপ্তানি করি তার তুলনায় আমদানি বেশি করি। কেন তা হয় তার অনেক কারণ আছে। তবে এর মূল কারণ আমাদের দেশে খনিজ তেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা যা আমাদের সেই আমদানির একটা বড় অংশ। যদি টাকার দাম কমে যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলেও একই পরিমাণ তেল আমদানি করতে বেশি ব্যয় করতে হবে। বিগত এক বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ তেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ৯% (ডলারে), এই সময়ে ডলারে টাকার দর কমেছে প্রায় ১০%। সুতরাং খনিজ তেলের দাম টাকায় বেড়েছে প্রায় ১৯%। খনিজ তেলের মোট চাহিদার প্রায় ৮০% আমাদের আমদানি করতে হয়।

টাকার দরের পতন আমাদের যে উদ্বেগের বিষয় তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। উদ্বেগের প্রধান কারণ, এই মুক্ত বাজার অর্থনীতির জমানায় টাকার দর কমলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী। অর্থনীতিবিদদের গবেষণার ফলাফল থেকে জানা গেছে, বিগত তিন দশকে ডলারের তুলনায় টাকার দরের ১ শতাংশ পতনের জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে প্রায় ০.৪১ শতাংশ। ১৯৯১ সালের আর্থিক সংস্কারের পরবর্তীকালে টাকার দরের পতনের জন্য মুদ্রাস্ফীতির হার যে বেড়েছে সেই নিয়ে অর্থনীতিবিদ মহলে কোনো দ্বিমত নেই।

ডলারের তুলনায় টাকার দরের এই দ্রুত পতনের আশু কারণ কী? সেই কারণ হলো 'ডলার সূচকের' নজরকাড়া বৃদ্ধি। 'ডলার সূচক' বিশ্বের প্রধান ছয়টি মুদ্রার তুলনায় মার্কিন ডলারের মূল্যের সূচক। বর্তমানে ডলার সূচক বিগত তিন বছরের মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চ। তার অর্থ, শুধুমাত্র 'টাকা' নয়, বিশ্বের অন্যান্য মুদ্রার তুলনায়ও ডলারের দাম বেড়েছে। বিগত বছরে মার্কিন শেয়ার বাজারের চমকপ্রদ উত্থান বিনিয়োগকারীদের আশাবাদী করে তুলেছে। ফলত অন্য মুদ্রার তুলনায় ডলারের চাহিদা বাড়ছে। ডলার সূচক উর্ধ্বমুখী। তার জেরে ভারতীয় মুদ্রার আন্তর্জাতিক দামও কমছে।

এটা ঠেকাতে হলে বিনিয়োগক্ষেত্র হিসেবে ভারতকেও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা দূরে থাক, বিনিয়োগকারীরা লগ্নির সম্ভাব্য গন্তব্যস্থল হিসেবে ভারতের উপর থেকে আশা হারাচ্ছেন। তার ওপর আবার সম্প্রতি মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঘুরপথে ডলারের যোগান বৃদ্ধির হার কমার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ২০১৩ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত নিট বিক্রি করেছেন প্রায় ২১০০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে জুলাই মাসেই বিক্রির পরিমাণ ১১৫০০ কোটি টাকা। ২০১৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রতি মাসে গড়ে নিট ১২০০০ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছেন। কিন্তু জুলাই মাসে নিট ক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। এর ফলে ডলারের যোগান সম্প্রতি হ্রাস পেয়েছে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল টাকার পতন।

ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা টাকার দর কমে যাবার আর একটি কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। ইউরোপের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য বিনিয়োগকারীরা ইউরো বিক্রি করে ডলারের দিকে ঝুঁকছেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের দাম বাড়ছে। ভারতকেও চড়া দামে ডলার কিনতে হচ্ছে। রপ্তানি বৃদ্ধি থেকে সেটা উশুল হবার সম্ভাবনা নেই। ভারতের রপ্তানির একটা বিরাট অংশ যায় ইউরোপে, যা মোট রপ্তানির প্রায় ২০ শতাংশ। ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দার জন্য ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি আশানুরূপ হতে পারেনি। গত দুই বছরে টাকার অংকে রপ্তানির পরিমাণ ২৫ শতাংশ হারে বাড়লেও আমদানির হার বেড়েছে টাকার অংকে ৩৭ শতাংশ। এই বছর আবার রপ্তানি বৃদ্ধির হার সামান্য কমেছে। এর ফলে বাড়ছে বাণিজ্য ঘাটতি। বিদেশ থেকে চলতি খাতে ডলার আসার সুযোগও কম। ফলত বাড়ছে চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ। এবছর চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৪.৫ শতাংশ।

টাকার পতন রোধ করতে দেশের আর্থিক বাজারে ডলারের যোগান বাড়ানো প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার থেকে ডলার বিক্রি করে ডলারের যোগান বাড়াতে পারে। কিন্তু এটি স্বল্পকালীন সমাধান। এর প্রধান অসুবিধা হলো

ভবিষ্যতে ডলারের বাজার আরও চড়া হয়ে উঠলে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে আরও ব্যাপক। সোনা বন্ধক রেখে জ্বালানি তেল আমদানি করতে হবে সে সময়। যেটুকু ডলারের সঞ্চয় আছে সেটা পুরো খরচ করে এখন টাকার দামের পতন রোধ করা হবে একেবারেই ভুল স্ট্র্যাটেজি। রিজার্ভ ব্যাংক এই ভুলটা করতে রাজি নয়। তবে এই অবস্থায় মুদ্রাভাণ্ডার একেবারেই ব্যবহার না করলে টাকার দরের পতন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংক সাধারণত দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করে। বর্তমান সংকটেও রিজার্ভ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার ব্যবহার করে টাকার দর সামান্য স্থিতিশীল করতে সাহায্য করেছে। পতন রোখার জন্য সর্বাত্মক লড়াইয়ে নামেনি।

রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে আর একটা অস্ত্র থাকে- সুদের হার বাড়ানো। সুদের হার বাড়লে বন্ডের প্রকৃত আয় বাড়ে, ফলে বিদেশি লগ্নিকারীরা বন্ডে বেশি লগ্নি করবেন এবং তাতে ডলারের যোগান বাড়তে পারে। কিন্তু সুদের হার বাড়লে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যাবার আশঙ্কা থাকে, কেননা সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগের খরচ বেড়ে যায়। বিনিয়োগের খরচ বাড়লে বিনিয়োগ অলাভজনক হয়ে ওঠে। নিট ফল, বিনিয়োগের গতি মন্থর হয়ে পড়া এবং তার ফলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া। এই অস্ত্রটাও তাই বেশি দূর ব্যবহার করা যাবে না।

নয়া উদারবাদী দাওয়াই হলো, এই অবস্থায় যেভাবে পারো প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াও। এই বিনিয়োগ ডলার যোগাবে। ডলারের দামও কমবে। এক কথায়, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ঘটনা এটাই যে ২০১২-১৩ সালে আগের বছরের তুলনায় প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রায় ৩৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। নয়া উদারবাদ বলছে, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য দরকার আর্থিক সংস্কারের গতি বৃদ্ধি করা। সম্প্রতি এই বিষয়ে কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের সীমা কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে। যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, বিমা, একক ব্রান্ডের খুচরো ব্যবসা ইত্যাদি। কাজের কাজ কিছু হবে কিনা সন্দেহ। একটা নড়বড়ে অর্থনীতিতে এই ধরনের পদক্ষেপ দেশটিকে 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য'র পরবর্তী লাতিন আমেরিকার অবস্থাতেও ঠেলে দিতে পারে।

টাকার দাম ও ভারতের অর্থনীতি

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

আশঙ্কা ছিলই, সেটাই ঘটল। এবং ঘটেই চলেছে। হুড়মুড়িয়ে পড়ছে টাকার দাম। দিনের শেষে মুদ্রা বাজারের নিওন-বোর্ডে যখন দেখাচ্ছে ডলার পিছু টাকার দাম ৬০ টাকা ৯ পয়সা তখন পাশ থেকে একজন বলে উঠল: শুনি তো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভল্টে নাকি শত শত কোটি ডলার রয়েছে। টাকার দাম যখন এভাবে রোজই পড়ছে তারা করেটা কী? এদিকে, বাজারের জোর গুঞ্জন, নিজে সরাসরি না নেমে ব্যাংকগুলিকে ডলার কিনতে নির্দেশ দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। টাকার এহেন ঐতিহাসিক-অভূতপূর্ব পতনে যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ''সময় হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাঠে নামবে। তার তূণে অনেক অস্ত্র আছে।'' হু হু করে টাকার এমন সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক পতনেও অর্থমন্ত্রী শান্ত। তাঁর সুস্পষ্ট আশ্বাস, ''এটা সাময়িক, বার্নানকে'র বিবৃতিতে ভারতের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে যায় নি।''

কে এই বার্নানকে? তিনি মার্কিন শীর্ষ ব্যাংকের শীর্ষ কর্তা। গত ২০শে জুন একেবারে স্পষ্ট তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে। তাই মাসে ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে বন্ড কিনে সাহায্য করার কর্মসূচি এবার ধীরে ধীরে বন্ধ হবে। আগামী ২০১৪র মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই বড় লগ্নি করা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে।

এরপরই বিশ্বজুড়ে ডলারের চাহিদা বাড়তে থাকে। পড়তে থাকল টাকার দাম, যত ডলার এদেশের শেয়ার-বন্ড-সোনায় লগ্নি ছিল বিদেশি সংস্থাগুলি রাতারাতি তা বেচে ডলার নিয়ে যাচ্ছে। টাকার দাম তাই এত দ্রুত পড়ছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল ও এশীয় অর্থনীতিতেও এরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পতন হয়েছে ভারতীয় টাকার। অর্থনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া মারাত্মক। সব জিনিসের দাম বাড়বে। বাড়বে আর্থিক ঘাটতি। অর্থনীতি আরও দুর্বল হবে। কোণঠাসা হবে দেশবাসী। খুব স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে : কেন এভাবে দাম পড়ছে? রিজার্ভ ব্যাংক কি করছে? টাকার দামের এই মহাপতন কি তারা ঠেকাতে পারে না? সরকার কী করছে?

এই মহাপতনের মূল কারণ হলো আমদানি-রপ্তানি খাতের ঘাটতি। রপ্তানিতে যে পরিমাণ ডলার আয় হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি চলে যায় তেল, সোনা, খাদ্যশস্য, নানা শিল্পসামগ্রী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানিতে। এত বেশি ঘাটতি যে বাজার থেকে ডলার কিনতে হয়। গত দু বছর ধরেই এই চলতি খাতের ঘাটতি ভীষণভাবে বাড়ছে। ঘাটতি বাড়ছে বলে টাকার দামও অনেক দিন ধরেই ধীরে ধীরে কমছিল।

তবে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংকের ঘোষণার পর যেভাবে ভারত থেকে বিদেশি লগ্নিকারীরা তাদের লগ্নি বেচে রাতারাতি চলে যাচ্ছে, সেটাই টাকার দামে দ্রুত মহাপতন ঘটিয়েছে। কারণ

তারা যত চলে যাচ্ছে, এদেশের রিজার্ভ ব্যাংকের ডলার সঞ্চয় তত কমে যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে ডলার আমদানিও। ফলে টাকার তুলনায় ডলার আরও বেশি মহার্ঘ্য হয়ে উঠছে। এই প্রবণতা তখনই বন্ধ হবে যখন বিদেশি লগ্নিকারীরা ফের ফিরে আসবে। কখন ফিরে আসবে? যখন দেখবে এখানে বিনিয়োগ তাদের ভালই লাভ হচ্ছে। কখন তা হবে? প্রথম কথা, যখন ডলারের তুলনায় টাকার দাম বাড়বে। কেন? কারণ তাদের আয় হবে টাকায়, সেটা অল্প হলেও যদি তা রূপান্তর করে বেশি ডলার পাওয়া যায় তাহলেই তাদের বেশি লাভ। অন্য সব দেশের চাইতে এদেশে এই ঘটনার ধাক্কা লেগেছে বেশি, কারণ এদেশের চলতি খাতে লেনদেন ঘাটতি (current account deficit বা সংক্ষেপে CAD) বাড়ছে, তাই মুদ্রার মানও ক্রমশ পড়ছে। এখানে ব্যবসা করে যত টাকা আয় হবে, ডলার মূল্যে তাতে তুলনামূলক লাভ কম। তাই সবথেকে বেশি বিদেশি লগ্নি তুলে নেওয়া হচ্ছে এই দেশ থেকেই। ঐ লগ্নি বিনিয়োগ হবে সেখানেই, যেখানে এই CAD কম, বা নেই, বা উদ্বৃত্ত রয়েছে, অর্থাৎ যে দেশে আমদানির চাইতে রপ্তানি বেশি। ভারতের অর্থনীতির মূল দুর্বলতার জায়গাটা এইখানে। আজকে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংকের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে যেভাবে হুড়মুড়িয়ে টাকার দাম পড়ছে, তেমন ঘটনা না ঘটলেও টাকার দাম ৬০ টাকাকে ছুঁতো। গত দশ মাসে টাকার দাম ১০ শতাংশ পড়েছে। গত দু বছরে দাম পড়েছে ১৫ টাকা। সরকার এই পতন রুখতে পারে নি, কারণ CAD কমাতে পারে নি। উল্টে তা দিনকে দিন বেড়েছে। ২০১০-১১ সালে CAD ছিল জিডিপির ২.৭ শতাংশ। ভারতের মতো দেশে এটা ২.৫ শতাংশ হওয়াই কাম্য। তারপর থেকে বাড়তে বাড়তে ২০১১-১২তে বার্ষিক গড় ৪.৮ শতাংশ, শেষ তিনমাসে হয়েছিল ৬.৭ শতাংশ। এভাবে ঘাটতি বাড়ার কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ও কমেছে। ফলে ঘরের থেকে ডলার বাজারে ছেড়ে ডলারের চাহিদা ও দাম কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। মার্চের ২০০৮-০৯ এ বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্কটের সময়েও টাকার দামে পতন ঠেকাতে রিজার্ভ ব্যাংক নিট হিসেব ৩৫ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছিল। কারণ তখন ভাঁড়ারে ছিল ৩০৯ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ১২-১৩ তে যখন ১০ টাকা দাম পড়ে গেল, বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় কমে গেছে বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখন বিক্রি করতে পেরেছিল মাত্র নিট হিসেব ২.৬ বিলিয়ন ডলার। ২০০৮-০৯ এ বিদেশি ঋণের যা পরিমাণ ছিল তার ১৩৮ শতাংশ ছিল বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ের পরিমাণ। তাই কোনও দুশ্চিন্তাও ছিল না লোন শোধ করার। গত বছর জুনে এর অনুপাতটা ৮২.৯ শতাংশে কমে গেছে। ফলে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় তহবিলের উপর জমে থাকা ঋণের চাপও বাড়ছে। এখনও সেসব শোধ করতে হবে না। তবু এমত অবস্থায় মহার্ঘ্য ডলার বাজারে ঢেলে টাকার দামের পতন ঠেকানোর ক্ষমতা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নেই। কারণ, গত মে মাসের শেষে তাদের ভাঁড়ারে ছিল মোট ২৮৮ বিলিয়ন ডলারের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়, তার মধ্যে বিদেশি মুদ্রায় সম্পদের পরিমাণ ২৫৯ বিলিয়ন ডলার। এত অল্প সঞ্চয় নিয়ে টাকার পতন ঠেকাতে গেলে আরও বড় সর্বনাশ হবে, কারণ ওইটুকু সঞ্চয় দিয়ে আগামী ৬-৭ মাস মাত্র আমদানি করা যাবে। মনে রাখতে হবে, চীনের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ের পরিমাণ তিন ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। জাপানেরও প্রায় দেড় ট্রিলিয়ন ডলার সঞ্চয়। এমন পদক্ষেপ তারা নিতে পারে। ভারসাম্যহীন বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে যেখানে তেল আর সোনা আমদানি করতেই দেশের প্রায় সব রপ্তানি-আয় চলে যায়, সেখানে টাকার দামের পতন অনিবার্যই ছিল। মার্কিন শীর্ষব্যাংক যখন কোনও মন্তব্যই করে নি তখনও আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারের গত মাসে ফিউচারের লেনদেনে টাকার দাম ডলার পিছু ৬০ টাকা ছিল। মার্কিন মুলুকে কী হবে না হবে তা যখন জানা ছিল না। তখনও এটা ভাবা হচ্ছিল যে টাকার দাম ডলার পিছু ৬০ টাকাই হতে চলেছে। আসলে এই দামটা নির্ভর করে দেশের অর্থনীতির মূল ফান্ডামেন্টাল্‌স এবং CAD-এর উপর। এগুলো নেতিবাচক হলে দাম পড়বেই, আজ, নয় কাল।

অথচ ১৯৯১ সালে ঠিক যখন এরকমভাবেই টাকার দাম হু হু করে পড়ছে, ঘরে মাত্র তিন সপ্তাহের বিদেশি মুদ্রা রয়েছে, সোনা বন্ধক দিয়ে দেশ চালাতে হচ্ছে, এমন অবস্থাতেই ভাবা হয়েছিল সংস্কার করেই মোড় ঘোরাতে হবে অর্থনীতির। তখন থেকেই যেন তেন প্রকারেণ বিদেশি মুদ্রার একটা 'ভাল' সঞ্চয় গড়ে তোলাটা যেন জাতীয় কর্তব্য হয়ে গেল। যে সরকার তা করতে পারবে সেই-ই দক্ষ। তাই সংস্কারের নামে আদতে উদ্বাহু হয়ে বিদেশি পুঁজি আনাই হল একমাত্র লক্ষ্য। অনেক বিধিনিষেধ শিথিল হল সেই উদ্দেশ্যে। বিদেশি লগ্নিও এল। গড়ে উঠতে থাকল কয়েক শো বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল। বৃদ্ধির হারে তার প্রতিফলন হল। ভারতীয় অর্থনীতির 'গ্রোথ স্টোরি' চমকপ্রদ 'সাফল্য' আর আশার ছবি দেখাতে শুরু করল। কিন্তু টাকার দাম পড়া, যার জন্য এত সংস্কার শুরু, তা থামানো গেল না। ১৯৯১ সালে ছিল এক ডলার পিছু ৩২.৪২ টাকা, ২০০০ সালে হল তা ৪৪.৯৮ টাকা। আর এখন হয়েছে ৬০.০৯ টাকা। কখনও দুটাকা ওঠে, তো পরে চার টাকা কমে। ওঠা-নামা যা হয় সবই ধীরে ধীরে, এত কম সময়ে নয়। তাই চোখেও পড়ে না। কিন্তু টাকার মূল্য মানে তো অর্থনীতির প্রকৃত শক্তির অন্যতম পরিচয়বাহক সূচক। টাকার দাম তাই পড়েছে, কারণ তলে তলে আসলে দুর্বল হয়েছে অর্থনীতিই। বৃদ্ধির 'বুদবুদে' তা নিয়ে হৈ চৈ তো কম হয় নি। অথচ বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যে নজর দেওয়াটা ছিল প্রধান কর্তব্য। কারণ চলতি খাতে ঘাটতি হলে তবেই টাকার দাম কমে। আর তার

মানে সব জিনিসের দাম বাড়া, মানুষের হাতে সঞ্চয় কমে আসা, ফলে অর্থনীতিতে চাহিদা কমে, নতুন লগ্নিও কমে আসে। কর্মসংস্থান কমতে থাকে, বাড়তে থাকে বেকারি। অর্থনীতির অন্যতম 'প্রাণভোমরা' হলো তাই এই চলতি খাতের পরিস্থিতি। এখানে ঘাটতি বাড়তে দিয়ে এতদিন বৃদ্ধির হার বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতির এটাই সব থেকে বড় 'মাইনাস পয়েন্ট'। এটাকেই 'প্লাস পয়েন্ট' করা যেত যদি আমদানি কমানোর জন্য সঠিক কৃষি ও শিল্পনীতি নেওয়া হোত, রপ্তানি বাড়াতে সঠিক উদ্যোগ নেওয়া হত। প্রতিটি ডলারের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে জাতীয় নীতি থাকত। তার বদলে সদা চঞ্চলা লগ্নিপুঁজি, যা যে কোনও মুহূর্তে চলে যায় বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে লাভের আশায়, তার উপরে ভরসা করে এই ঘাটতি মেটানোর কথা ভাবা হচ্ছে। এ যেন 'পনজি স্কিম'। দেনা মেটানো হবে নতুন নতুন আমানতের ভিত্তিতে। আমানত আসা কমলে বা বন্ধ হলে সেদিনই দেউলিয়া। গোটা দেশ কি কখনও এভাবে চলতে পারে? অথচ এটাই হয়ে আসছে। যখনই চলতি খাতে ঘাটতি হয়, তখনই তা সামাল দেওয়ার জন্য সংস্কার করে বিদেশি লগ্নি ডাকা হয়। এভাবেই দেশে যত বিদেশি মুদ্রা আসে, তার বেশিটাই খরচ হয়ে যায় আমদানির বিল মেটাতে। উন্নয়নে লগ্নি হলে তবে তো উৎপাদন হবে। তাই-ই হচ্ছে না, উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর তাই প্রশ্নও নেই। অর্থনীতির পরিচালনা এহেন হলে দেশের মুদ্রার মূল্য এভাবে মুখ থুবড়ে পড়বেই। তাই হচ্ছে, হয়েছে এবং হয়েই চলেছে। এজন্যই বৃদ্ধির হার এখন যাই-হোক, যতই সংস্কারের জন্য চিদম্বরম উদ্যোগ নিন, বিশ্বের বৃহৎ রেটিং এজেন্সিগুলি (এস এন্ড পি, ক্রিসিল, ফিচ ইত্যাদি) ভারতের রেটিং বাড়াতে চায় না। উল্টে তারা বলে চলেছে, রেটিং কমানো হবে যদি চলতি খাতের ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক ঘাটতি সামাল দিতে না পারা যায়। আসলে অর্থনীতির হিসেবে এরা সবই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এরা ঠিক থাকলে প্রকৃতই 'বৃদ্ধি' হবে। 'বৃদ্ধি' বিকাশে পরিণত হবে।

এখন করণীয় কী? অর্থনীতির মৌলক্ষেত্রগুলির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে রপ্তানী-বৃদ্ধি একটি দীর্ঘমেয়াদি কাজ। তার চেষ্টাও করতে চায় না সরকার খুব একটা। যদি চাইত তাহলে আগে মৌলক্ষেত্রগুলির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রেখে বিদেশি পুঁজিকে ব্যবহার করত। বিশ বছরের সংস্কার প্রক্রিয়ায় তা হয়নি। বরং কংগ্রেস, বিজেপি যে দলের নেতৃত্বেই সরকার চলুক, বিশ্বায়িত পুঁজির লেজুড় হয়ে এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চলেছে। তাদের কাছে একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে : বিদেশি পুঁজি টানার নামে ক্রমশ দেশটাকে মার্কিন লবির কাছে একটা 'ক্লায়েন্ট-স্টেট' হিসেবে তুলে ধরা। '৯১ থেকে আজ পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছে। আরও আমদানি, আরও বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অর্থনীতিকে রপ্তানিভিত্তিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কার চলছে। বস্তুত দেশের অর্থনীতিকে ক্রমশ বিদেশি পুঁজি নির্ভর করে গড়ে তোলাটা হয়ে গেছে এদেশের শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক এজেন্ডা। তাই দিল্লির মসনদে দল বদলালেও আন্তর্জাতিক পুঁজির অসুবিধা হয় না। এই পরিস্থিতির সুযোগটাও তারা নিচ্ছে, বিশেষত ফিনান্স পুঁজি। এখন তাদের লক্ষ্য এদেশের আর্থিক ক্ষেত্র, বিমা, পেনসন, বেসরকারি ব্যাংকিং ক্ষেত্র এবং খিড়কির দরজা দিয়ে ক্রমশ ব্যাংক বেসরকারিকরণের রাস্তা তৈরি করে সংস্কারের গতি বাড়াতে চাইছে সরকার। উদ্দেশ্য, অর্থনীতিতে ঢালাওভাবে বিদেশি পুঁজির সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্য খাতের ঘাটতি মেটাতে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ওই পুঁজির ভরসায় গড়ে তোলা। এইভাবেই গত বিশ বছর ধরে ক্রমশ একটি মেকি ঔজ্জ্বল্যের বৃদ্ধির হার দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। এখন মার্কিন অর্থনীতির চাঙ্গা হওয়ার ইঙ্গিতে ডলারের দাম বৃদ্ধিতে সেই বৃদ্ধির নটে গাছটি শুয়ে পড়তে চলেছে। অর্থনীতির এখন বেহাল পরিস্থিতির পরেও আরও আর্থিক সংস্কার, বিদেশি পুঁজির উর্ধ্বসীমা আরও বাড়ানো, আরও সম্প্রসারণের চেষ্টা অব্যাহত। বেসামাল বাণিজ্য ঘাটতি আর পড়ন্ত টাকার দমের প্রেক্ষিতে এখন ঘাড়ে চেপে বসতে চাইছে বিদেশি পুঁজি। ন্যূনতম শর্তগুলিও তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে তারা। খুচরো ব্যবসায় পরিকাঠামো-লগ্নি বা দেশীয় উৎপাদকের পদ থেকে ৩০% পণ্য বাধ্যতামূলকভাবে কেনার মতো শর্তগুলি তুলে নিতে চাপ দিচ্ছে ওয়ালমার্ট, ইবে-র মতো বৃহৎ বহুজাতিক খুচরো বিপননের সংস্থা। এদিকে পেনশন ও বিমায় ৭৪% পর্যন্ত লগ্নির সীমা বাড়িয়ে নিল বিদেশি সংস্থারা। এবারে আরও খুল্লাম খুল্লা হয়ে চিদম্বরম চাইছে প্রতিরক্ষা, মিডিয়া, বিমান পরিষেবাসহ নানা ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির ক্রম সম্প্রসারণ।

এটাই হবার কথা ছিল, এবং এটাই ঘটতে চলেছে। আগে এসব করতে গেলে প্রবল রাজনৈতিক বাধা আসত। এখন সে বাধা থাকবে না। বলা যাবে, সংকট মোচনে এ ছাড়া কোনো পথ নেই। এরকমই ঘটেছিল গত শতকের আশির দশকে লাতিন আমেরিকায়। ঘটানো হয়েছিল কিছু সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়ে। এখানে ঐ কাজটা শেষ অংকটায় ড্রাইভারের সিটে বসে আছে যারা তারাও এরকমই। মনে রাখতে হবে, মনমোহন-চিদম্বরম-রঘুরাজনদের সবাই বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তনী, এখন টাকার দামে ধস নামায় তারা বিশ্বব্যাঙ্ক প্রদর্শিত পথেই আরব্ধ সংস্কারের মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রা আয়ের পথ বাতলাচ্ছেন। এভাবে যে গোটা অর্থনীতিটাই কার্যত বিদেশি পুঁজি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে, এবং একদিন পুরো কাঠামোটাই যে মুখ থুবড়ে পড়বে, তা নিয়ে এরা কেউ ভাবতে রাজি নন। টাকার পতন ঠেকানোর নামে অর্থনীতির পতনই ডেকে আনা হচ্ছে, এ নিয়ে সরকারের তাই ভ্রুক্ষেপ নেই।

প্রবন্ধ

‘এত মাওবাদী কেন?’

সঞ্জীব আচার্য

বেলপাহাড়ীতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা, বিপুল জমায়েত। সভার মধ্যে থেকে একজন মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সারের দাম এত বাড়ছে কেন’? ব্যস, তাতেই আগুনে ঘি। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে মঞ্চ থেকেই মাইকে বলে উঠলেন, “ওকে ধরুন, ও ‘মাওবাদী’”। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হলো। কিন্তু আদালতে শিলাদিত্য জামিন পেলেন। পুলিশের তদন্তে প্রকাশ হলো, শিলাদিত্য এক গরিব কৃষক। সারের দাম বাড়ায় চিন্তিত। মাওবাদী রাজনীতির সঙ্গে তাকে চেষ্টা করেও পুলিশ যুক্ত দেখাতে পারলো না। বরং শিলাদিত্য তৃণমূল দলের সমর্থক হিসাবেই পরিচিত। এই শিলাদিত্যকে গ্রেপ্তার করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ থেকেই সগর্বে বলে উঠেছিলেন, “দেখলেন কেমন মাওবাদী ধরিয়ে দিলাম”।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এসপ্ল্যানেডে মেট্রো সিনেমার সামনে সভা করার অনুমতি পেয়েছিলো পুলিশ প্রশাসনের কাছে। পরে কোনও কারণ না দেখিয়েই লালবাজার থেকে ঐ স্থানে সভা করার অনুমতি বাতিল করা হয়। এপিডিআর সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রশাসনের এই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে। ঐ স্থানে তৃণমূল দলের একাধিক সভার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রশ্নে সরকারের অনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় এপিডিআর-কে অনুমতি দিয়েও বাতিল করে প্রশাসন। সাংবাদিক সম্মেলনে মহাশ্বেতা দেবীও উপস্থিত থেকে প্রতিবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী আবারও ক্ষিপ্ত। সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, “এপিডিআর মাওবাদীদের মুখোশ”।

গত ৯ মে সিএনএন টিভি চ্যানেলে ছাত্রছাত্রীদের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত এক ছাত্রী তানিয়া ভরদ্বাজের একটি প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে অনুষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। তানিয়াকেও তিনি চিহ্নিত করেন ‘মাওবাদী’ বলে।

কামদুনিতে অপরাজিতা (পরিবর্তিত নাম)-কে ধর্ষণ করে হত্যা করা হলো। বিচার চেয়ে সমগ্র গ্রামবাসী একত্র হয়ে রাস্তায় নামলেন। আন্দোলন শুরু করলেন। পরিস্থিতির চাপে মুখ্যমন্ত্রী কামদুনি গ্রামে দেখা করতে গেলেন। ধর্ষিতা ছাত্রীর মা বাবার সাথে কথা বলেই গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে গ্রামবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীকে তাদের কথা শোনার জন্য অনুরোধ করেন। ধর্ষিতা ছাত্রীর সহপাঠিনী টুম্পা এবং প্রতিবেশিনী মৌসুমী মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, “দিদি, আমাদের কিছু বলার আছে”— সুতরাং আবার ক্ষিপ্ত মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, “সাট আপ”। পরে বললেন, “ওরা সিপিএম”। আরও পরে বললেন, ওরা ‘মাওবাদী’। কামদুনি গ্রামে পুলিশের পাহারা বসলো। গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার জন্য নয়। ‘মাওবাদী’ গ্রামে রাষ্ট্রের অতন্দ্র প্রহরার জন্য। গ্রামে ঢুকতে গিয়ে তল্লাসির সামনে পড়লেন জামাই। কারণ গ্রামটা ‘মাওবাদী’।

নোনাডাঙ্গার বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন বস্তির মানুষেরা। সরকারের পুনর্বাসনের জমি বেসরকারি হাসপাতাল চক্রের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা। আন্দোলনের পাশে দাঁড়ালেন বহু সংগঠন, বহু মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী তোপ দাগলেন আন্দোলনকারী ও তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে। “ওখানে মাওবাদীরা যুক্ত”। পুলিশ আন্দোলনকারীদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে ‘মাওবাদী সম্মত’ ভাবে আটকে রাখলো।

সুটিয়ায় বছরের পর বছর ধরে চলে আসা নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে মঞ্চ তৈরি করে প্রতিবাদ করছিলেন স্কুল শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। ২০১২ সালের স্টেশনে তাকে গুলি করে হত্যা করে অভিযুক্ত সমাজবিরোধীরা। এর প্রতিবাদে আন্দোলনে সামিল হল চাঁদপাড়া এপিডিআর শাখা। তাদের তথ্যানুসন্ধানে এই হত্যার সাথে তৃণমূল দলের কিছু নেতার যোগসাজসের হদিশ মেলে। এই তথ্য প্রকাশ পেতেই ক্ষিপ্ত এলাকার বিধায়ক খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি এপিডিআর চাঁদপাড়া শাখার সভাপতি নন্দদুলাল দাসের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন, নন্দদুলাল দাস মাওবাদী। অথচ, নন্দদুলাল দাস অন্য একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী। তিনি সিপিআইএমএল লিবারেশন দলের এলাকার নেতা। একথা সবাই জানে, জানেন খাদ্যমন্ত্রীও। তবুও তাঁর অভিযোগ, নন্দদুলাল ‘মাওবাদী’। কারণ নন্দদুলালকে টাইট দিতে হবে।

পরিবহনমন্ত্রী মাননীয় মদন মিত্র বিবৃতি দিলেন, “বেলঘরিয়া স্টেশনে মাওবাদীরা ঘোরাফেরা করছে। এলাকার মেসগুলিতে তারা আস্তানা নিচ্ছে”। পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠলো, বেলঘরিয়ার স্টেশন চত্বরে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি কমতে থাকলো। মেসে বা পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকা গ্রাম-মফস্বলের ছেলেরা ভীত হয়ে উঠলো। এলাকার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কর্মী হিমাদ্রি মজদুর ক্রান্তি পরিষদ (MKP) দলের সদস্য। এলাকাবাসীর অতি পরিচিত। বেলঘরিয়া থানা থেকে তাকে ডেকে পাঠিয়ে জেরা করা হলো। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে তার গতিবিধি পুলিশ নজরে রাখছে। অর্থাৎ সম্ভাব্য ‘মাওবাদী’। হিমাদ্রি ২১ জুন কামদুনির ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার মহামিছিলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। শাসক

দলের ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ বোধহয় সেটাই।

উপরের এই তালিকা বাস্তবে আরও দীর্ঘ। জঙ্গলমহলে সামগ্রিকভাবে যে কোনও রকম বিরোধিতা শাসকদলের চোখে 'মাওবাদী'। তাই মিটিং মিছিলের অনুমতি নেই তৃণমূল কংগ্রেস বাদে অন্য কোনও দলের।

কিন্তু উপরে উল্লিখিত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটা সাধারণ তক্‌মা লাগানোর চেষ্টা হয়েছে— এরা 'মাওবাদী'। এই প্রত্যেকটি ঘটনায় আরেকটি মিলের জায়গা হচ্ছে যে এই ঘটনাগুলির কোনটাতেই তৃণমূল কংগ্রেসের অনুমোদন বা অংশগ্রহণ ছিলো না। কারণ প্রতিবাদ বা আন্দোলন তৃণমূল কংগ্রেস বা দলের অনুগত গণসংগঠন করেই থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বা অপছন্দের উপাচার্যের বা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। কিন্তু অন্য প্রতিবাদ শাসকদলের না-পসন্দ্। তাই শিক্ষা দিতে হবে। অথবা আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু শাস্তি দেওয়ার মতো উপযুক্ত বা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখানো যাচ্ছে না। তাই দরকার অযৌক্তিক ভাবেই, আইন বহির্ভূত ভাবেই শায়েস্তা করার। দরকার যারা এই প্রতিবাদে যুক্ত হতে চায় তাদের বিচ্ছিন্ন করার। দরকার ওদের বিরুদ্ধে পুলিশকে লাগামছাড়া হওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার। তাই দেগে দিতে হবে— 'ওরা মাওবাদী'।

একবার 'মাওবাদী' বলে দেগে দিলে সভা করার অনুমতি না দেওয়াটাই প্রশাসকের হক্, মৌসুমীর প্রশ্ন করার অধিকার অসংবিধানিক, শিলাদিত্যর সভাস্থলে হাজির হওয়াটাই চক্রান্ত, নন্দদুলালকে গ্রেপ্তার হয়ে জামিন না পাওয়াটাই ন্যায়বিচার। 'মাওবাদী' বলা হয়েছে আর তারপর শাসকদল ও প্রশাসন ঠিক এই কাজগুলোই করেছে। আসলে এই কাজ করবে বলেই 'মাওবাদী' তক্‌মা লাগিয়েছে।

উপরের প্রত্যেকটি ঘটনায় দেখা গেছে, এরা কেউই 'মাওবাদী' নয়। এদের প্রত্যেকে নিজে বা সাংগঠনিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কাগজে, টিভি চ্যানেলে। সংবাদমাধ্যম বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিকরা দেখিয়েছেন, এরা কেউই 'মাওবাদী' নয়। তবু এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন বা মুখ্যমন্ত্রী গণতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক বা প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা পালন করেন নি। উল্টে হয়রানি করছেন। বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতারা আলোচনার সময় এ ধরনের কাজের নিন্দা করেছেন। কিন্তু তাতে মুখ্যমন্ত্রী বা শাসকদল থামে নি। ক্রমশই 'মাওবাদী' তত্ত্ব প্রয়োগে শাসকদল বা প্রশাসন অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। কারণ প্রশাসন বা শাসকদল বা রাষ্ট্র যা চায় সেই বশ্যতা বা প্রতিবাদহীনতা জারি রাখার ক্ষেত্রে ভীষণ কার্যকর কৌশল হলো— 'ওরা মাওবাদী'। তাহলে গুলি চালাও, গ্রেপ্তার করো হয়রানি করো, জামিন না দাও, সভা করতে না দাও, আন্দোলন ভেঙে গুড়িয়ে দাও— জবাব দিতে হবে না— কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। না বিচারব্যবস্থাকে, না নাগরিক সমাজকে। নাগরিক সমাজও কৈফিয়ৎ চাইবে না। আমরা চাইও নি। প্রতিটি ঘটনায় যখন মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রী অভিযোগ করেছেন 'ওরা মাওবাদী', আমরা প্রশ্ন তুলিনি যে 'ওরা মাওবাদী হোক বা না হোক— তার সাথে এই ঘটনায় প্রশাসন বা মুখ্যমন্ত্রী যে আচরণ করেছেন তা কি করে সমর্থনযোগ্য হয়'? আমরা বলিনি, 'মাওবাদী' হলেই কি বরুণ বিশ্বাসের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার সংশ্লিষ্টতার প্রশ্ন তোলাটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়ে যায়? না, এই প্রশ্ন আমরা তুলিনি। 'আমরা কেউ মাওবাদী নই' প্রমাণ করতে যতটা ব্যস্ত হয়েছি তার ভগ্নাংশও ভাবিনি ঐ প্রশ্নটাও তোলা উচিত— 'মাওবাদী'ই যদি হয় তাহলেই কি যা খুশি করা যায়?

এই প্রশ্ন তোলার কথা ভাবি নি। একজন নাগরিক হিসাবে, রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে, সংবিধানের প্রতি মান্যতা দেওয়া বুদ্ধিজীবী মানুষ হিসাবে, একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিক হিসাবে এই প্রশ্নটা তোলার চেষ্টাই করিনি। এখানেই রাষ্ট্র বা প্রশাসনের জিত। বিগত এক দশক ধরে রাষ্ট্র এই চেষ্টাটাই করেছে। যাতে আমরা ঐ প্রশ্ন না তুলি। সিপিআই(মাওবাদী) একটি রাজনৈতিক দল। কিন্তু রাষ্ট্র সবসময় চেষ্টা করে গেছে মাওবাদী দলের সমস্ত কাজকেই আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে দেখাতে। তাদের সন্ত্রাসবাদী, রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে দেখাতে। রাষ্ট্রের প্রচারে আমরাও সমস্যাটাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করার অভ্যাস ত্যাগ করেছি। বছরের পর বছর ভুয়া সংঘর্ষে হত্যা, নির্বিচার গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে আটক— এটাই ছিলো মাওবাদী প্রশ্নে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কেন্দ্র সরকার-রাজ্য সরকার উভয়ের সম্মতিতেই। কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি-সহ প্রায় সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দলের যৌথ সংহতিতেই রাষ্ট্রের এই নীতি। দীর্ঘদিন ধরে দেখতে দেখতে, প্রতিবাদ না করতে করতে আমরাও কোথাও একটা মানসিক সম্মতি দিয়ে ফেলেছি যে 'মাওবাদী' হলেই দেখামাত্র গুলি করা যায়, গ্রেপ্তার করাটাই স্বাভাবিক, মাওবাদীর তোলা প্রশ্ন যতই ন্যায্য হোক না— উত্তর দেওয়ার দায় নেই, জেলের ভেতর তাকে আটকে রাখাটাই নিয়ম। এটাই রাষ্ট্র চায়। সহমত নির্মাণ। নাগরিক সম্মতি। রাষ্ট্রকে বেআইনি হওয়ার, অগণতান্ত্রিক হওয়ার।

ভিন্ন সুর মাঝে মাঝে শোনা গেছে, সরকারের তৈরি করা কমিটি রিপোর্টে বলেছে, "মাওবাদী সমস্যাটা শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়। উন্নয়নের বৈষম্য ও দীর্ঘদিনের বঞ্চনার তীব্রতা এই সমস্যার উৎস।"— রাষ্ট্র শোনে নি। আমরাও প্রতিবাদ করিনি। বিনায়ক সেনের মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, "শুধুমাত্র মাওবাদী তত্ত্বে বিশ্বাস করাটা কোন অপরাধ নয়।"— অথচ দেশের কেন্দ্র-রাজ্য সরকার উল্টোটাই

আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে। 'মাওবাদী' মানেই অপরাধী। এদের বিরুদ্ধে বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনী (সালোয়া জুড়ুম/হার্মাদ বাহিনী) নামিয়ে দিতেও কসুর করে নি। সুপ্রিম কোর্ট সালোয়া জুড়ুমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরেও রাষ্ট্র পিছু হটে নি। আমরাও যথেষ্ট প্রতিবাদ করিনি।

সিপিআই(মাওবাদী) দলের রাজনৈতিক আদর্শ, পথ কিংবা কর্মপদ্ধতি নিয়ে একজন নাগরিক হিসাবে, রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমার হাজারোটা প্রশ্ন থাকতেই পারে। তীব্র বিরোধিতাও থাকতে পারে। তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে লড়াই করার সমস্ত অধিকার আমার আছে। প্রতিবাদযোগ্য মনে হলে মাওবাদীদের যে কোন কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত। প্রকাশ্যেই। কিন্তু আমার মত মাওবাদী দলের মতের বিরোধী হলেও রাষ্ট্র বা সরকার যদি মাওবাদী দলের কর্মী-সমর্থকদের অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ভাবে নির্যাতন করে তখন আমাকেই প্রতিবাদ করতে হবে। মাওবাদী দলের নেতা আজাদকে আলোচনার জন্য ডেকে এনে হত্যা করেছিলো অন্ধ্র পুলিশ, কেন্দ্রের সম্মতিতেই। সুপ্রিম কোর্ট এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছিলো, "রাষ্ট্র তার সন্তানকে হত্যা করতে পারে না"। — অথচ পার্লামেন্টে কেউ প্রশ্ন তোলে নি। সিআরপিএফ দিয়ে ছত্তিশগড়ে একটি জেলার সাতশো গ্রামের আদিবাসীদের উৎখাত করা হয়েছে। আদিবাসীদের প্রতিরোধ আন্দোলন দমন করার জন্য 'গ্রিনহান্ট' নামে সরকারি নির্যাতন প্রকল্প চালু হয়েছে — গ্রামের পর গ্রামে সভা চলাকালীন গুলি চালিয়ে শিশু-নারী সহ বহু আদিবাসীকে হত্যা করেছে পুলিশ-সিআরপিএফ। সবই মাওবাদী নামে। আমরা নাগরিক সমাজ প্রশ্ন তুলিনি। সুপ্রিম কোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও। পশ্চিমবঙ্গেই লালমোহন টুডুকে বাড়ীর সামনে গ্রেপ্তার করার পর গুলি করে মারা হয়েছে। সিদো সোরেন, শশধর মাহাতো সহ বেশ কয়েকজনকে যৌথবাহিনী হত্যা করেছে জঙ্গলমহলে। বামফ্রন্ট রাজত্বে। মাওবাদী বলে। আমরা প্রশ্ন তুলি নি। পরিবর্তনের পর মাওবাদী নেতা কিষেণজীকে সংঘর্ষের নামে হত্যা করা হয়েছে। সরকার বা বাহিনীর এই কাজের প্রতিবাদ না করার মধ্যে দিয়ে সরকারের কৌশলকেই আমরা শক্তিশালী করেছি। মাওবাদী হলে তাকে হত্যা করাটাও কোনও দোষের নয়, নির্যাতন তো করাই যায়— এই ধারণা গড়ে তোলার, গণমানসে এই ধারণাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার সরকারি উদ্যোগের নীরব অনিচ্ছুক দোসর হয়ে গিয়েছি। এখন আমরাই ঐ ধারণার শিকার— লক্ষ্যবস্তু। একবার ধারণাটা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যা খুশি করা যাবে এবং দরকার পড়লে যার বিরুদ্ধে যা খুশি করার ইচ্ছা হবে বা প্রয়োজন হবে তাকে 'মাওবাদী' বলে ঘোষণা করে নিলেই হলো। বাকিটা তো ঐ ধারণার ঢালে আপন নিয়মে গড়িয়ে যাবে। হচ্ছেও তাই। অন্যান্য রাজ্যেও। এই রাজ্যেও। বামফ্রন্টের আমলেও। এই আমলেও। কারণ সব শাসকের কাছেই এটা কার্যকর অস্ত্র।

এই অস্ত্র কার্যকর করে গড়ে তোলা হয়েছে। জনবিক্ষোভ, জল-জমি-জীবিকা কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান তৃণমূল সরকার এই কৌশল বা অস্ত্রের প্রবর্তক নয়। কেন্দ্রের কংগ্রেস বা বিজেপি সরকার-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যে এর সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলাতেও বামফ্রন্ট আমলে এই অস্ত্রে শান দেওয়া হয়েছে। মুখে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ের কথা বলে কার্যত কেন্দ্রের দমননীতিরই প্রয়োগ করা হয়েছে মাওবাদী প্রভাবিত অঞ্চলে। কয়েক হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছে বামফ্রন্ট আমলে, শুধুমাত্র মাওবাদী সন্দেহে। ইউএপিএ-র মতো কালা আইন প্রয়োগ করা হয়েছে প্রায় ৭০ জনের বিরুদ্ধে। তারা সকলেই আজও জেলবন্দী। পরিবর্তনের পরেও। বিরোধী আন্দোলনকে 'মাওবাদী' তক্মা দেওয়ার বহু ঘটনা বামফ্রন্ট আমলেও ঘটেছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেই উত্তরাধিকারই বহন করছেন। নিজের কায়দায়। যদিও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেত্রী থাকাকালে বলতেন, "মাওবাদী বলে কিছু নেই"। আর এখন তিনিই সবেতেই 'মাওবাদী' দেখতে পাচ্ছেন। পরিবর্তন এটাই। কারণ প্রশাসক হিসাবে এটাই তাঁর কাজে লাগবে। কোনও উপাচার্যকেও যদি মারতে হয় তাহলে তাকেও একবার 'মাওবাদী' দেগে দিতে পারলেই 'কেল্লা ফতে'।

তাই বর্তমান সরকার 'প্রতিবাদী' মাত্রেই 'মাওবাদী' ধরনের যে প্রশাসনিক অপকৌশলের ধারাবাহিক প্রয়োগ শুরু করেছেন তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে 'ওরা মাওবাদী নয়'— এই ঘোষণাতে থেমে গেলে বিপদ কাটবে না। কারণ বহু প্রতিবাদের ক্ষেত্রে প্রতিবাদীরা কোনও রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পরিচয়ে না থাকতেই পারেন। দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গড়ে ওঠা যে কোনও প্রতিবাদের সামনে বিপদ বাড়বে, 'মাওবাদী নই' প্রমাণ করার দায় থেকে। আর এই ফাঁকটাকেই ব্যবহার করবে বর্তমান সরকার। ক্ষমতার শাসানিতে লালফুল হয়ে যাচ্ছে নীলপদ্ম, 'মাওবাদী' বানাতে আর কতক্ষণ! প্রমাণ না-ই বা করা গেল। হয়রানি করতে তো আটকাবে না। তাই প্রয়োজন সরকারের এই অস্ত্রটাকেই ভোঁতা করার। 'মাওবাদী' হলেই তার সাথে অসঙ্গত, অনৈতিক, অসাংবিধানিক আচরণ করা যায় না— এই ধারণা, এই বিশ্বাস সমাজে স্থাপন করতে না পারলে সরকারের হাতে ঐ 'মাওবাদী' অস্ত্র ব্যবহারের জন্য থেকেই যাবে। অস্ত্র থাকলে ব্যবহার হবেই। কারণ অস্ত্র তৈরিই হয় ব্যবহার করার জন্য।

রাষ্ট্র 'মাওবাদী' নামক একটি শব্দবন্ধে এক সামাজিক ধারণা

এর পর ২১ পৃষ্ঠায়

অন্য চোখে

গণতন্ত্র ঃ গুরুস্থানে গোরস্থান

মালবিকা মিত্র

ঋত্বিক ঘটক বলতেন, কার্তিক দেখতে যেমন হোক, মাথায় জল ঢাললে সবার ভেতরের খড় বেরিয়ে পড়বে। এই সহজ কথাটা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই। নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মতো বলতে থাকি; ব্রিটেন-আমেরিকার গণতন্ত্র আর মানবিক অধিকারের প্রশংসায় মূর্চ্ছা যাই। ওগুলো হলো গণতন্ত্রের মক্কা, ব্যাপারই আলাদা। এসব প্রাচ্য দেশের গণতন্ত্র হলো মেকি... ভেজাল। অরিজিনাল আর জেরক্স কপির তুলনা!

কথাটা ঠিকই, ভুল নেই। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাই... অথবা সুদীপ্ত-নোনাডাঙ্গা-কামদুনি... সর্বত্র শাসকের একটা জুজু 'বহিরাগত' এবং 'মাওবাদ'। শাসক দেখায় সংখ্যার আস্ফালন। আর বিরোধীপক্ষের হা-হুতাশ, শিক্ষা নেই, চেতনা নেই, জনতা হলো ভেড়ার পাল। দুকেজি চাল অথবা এক বোতল চোলাই মদে ভোট কেনা যায়। দারিদ্র্য আর অশিক্ষা হলো ভোট ব্যাঙ্ক। ভাত ছড়ালেই কাকের ভিড়। হুঁঃ! তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্র! যে মানুষ জানেই না কী তার অধিকার, সেই নাকি অধিকারের রক্ষক। এই ভেজাল গণতন্ত্রের সাথে পশ্চিমী গণতন্ত্রের কোনো তুলনা চলে না।

চলবে না কেন? এখানে জাতপাতের জিগির দিয়ে জনমত গঠন আর জার্মানিতে ইহুদি বিদ্বেষ ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ছড়িয়ে জনমত গঠন। ভাবা যায়, জার্মান আইনসভা (রাইখস্ট্যাগে) হিটলার নিজে আগুন লাগালো, কমিউনিস্টদের ঘাড়ে দোষ চাপালো, তারপর কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল। সাজানো প্লট। জার্মানি কিন্তু শিল্পোন্নত, শিক্ষিত, সমৃদ্ধ পশ্চিমী জাতি। মানুষ ওখানেও বিভ্রান্ত... প্রতারিত। ভাবো, ভার্সাই চুক্তির পর জার্মান অধ্যুষিত সুদেতান অঞ্চল চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো। হিটলার প্রথমে গোপনে সুদেতান জার্মানদের চেক সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে মদত দিল। চেক সরকার সুদেতানে জার্মানদের দমন করলো। এবার হিটলার সুদেতানে জার্মানদের রক্ষায় সক্রিয় হলো, সুদেতান জয় করলো। অতঃপর হিটলার সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করলো। একটা আগ্রাসী সিদ্ধান্ত, সেটা কার্যকর করার পূর্বে জনসম্মতি গঠনের কত না ছলচাতুরি।

তুমি পশ্চিমকে দুয়ো দিতে গিয়ে বেছে নিলে একটি ফ্যাসিস্ট দেশের নমুনা। গণতন্ত্রের কথা বলো, বৃটেন আমেরিকার কথা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সমরাস্ত্র নির্মাণ শিল্প ছিল সে দেশের প্রধান শিল্প। যুদ্ধ পরবর্তী যুগে এই অস্ত্র উৎপাদন ও অস্ত্র ব্যবসা অব্যাহত রাখতে ঠাণ্ডা লড়াই, একটা স্থায়ী উত্তেজনার পরিবেশ জারি রাখা দরকার ছিল। তাছাড়া সোভিয়েত বিরোধী যেসব জঙ্গি গোষ্ঠী, কোথাও তালিবান কোথাও সাদ্দামকে আর্থিক ও সামরিক মদত চলল। ১৯৯০-এর পর পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েতের পতন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটাল। অস্ত্র ব্যবসার সমাপ্তি? কদাচ নয়, এক নতুন শত্রুর আমদানি হলো। 'সন্ত্রাসবাদ'। সাদ্দাম হোসেন, তালিবানকে শত্রু শিবিরে ঠেলে দেওয়া হলো। জীবাণু অস্ত্র... কুর্দদের হত্যা... ৯/১১র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা... অতঃপর হাল্লা চলেছে যুদ্ধে। যুদ্ধ ও অস্ত্রব্যবসা হলো সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে জনমত চাই। অতএব তেমনভাবেই ঘটনা ঘটবে। বলা ভালো ঘটানো হবে। চমস্কি এটাকে নাম দিয়েছেন 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট'।

তার মানে তুমি বলতে চাইছো রাইখস্ট্যাগে আগুন বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ৯/১১র হামলা এসবই 'ম্যানুফ্যাকচার্ড'? ইরাক বা আফগানিস্তান আক্রমণের অজুহাত মাত্র!

আমি বুঝতে পারছি, এই নির্মম সত্যটা মেনে নেওয়া তোমার পক্ষে অসুবিধাজনক। এটা তো মানো, সাদ্দাম-লাদেন এসবই মার্কিন সৃষ্ট ও মদতপুষ্ট। মনে করে দেখো, প্রথম নির্বাচনে বারাক ওবামার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, আফগান যুদ্ধ সমাপ্ত করে ঘরের ছেলেদের ঘরে ফেরানো... অর্থাৎ সেনা প্রত্যাহার। ক্ষমতায় এসে কত না গড়িমসি চলল, তিন ধাপে সেনা প্রত্যাহার হল ৩৮ হাজার; আর নতুন সৈন্য এলো ৬৫ হাজার। আফগানিস্তান-ইরাকে দু'চারটে নাশকতা-বিস্ফোরণ হবে। ভারত সরকার মার্কিন সেনা অপসারণে শঙ্কা প্রকাশ করবে। প্রমাণ করা হবে, সেনা প্রত্যাহার হলেই জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত হবে। ফিরে তো যেতেই পারি, যে কোনো সময়ে, কিন্তু কেন যাবো! বিশ্বশান্তির দায়... জঙ্গিবাদ নিকেশ করে তবে যাবো। অতএব সেনা প্রত্যাহার হলো না। মানুষও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, মেনে নিল। এটাই 'ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট'। গণতন্ত্র আর একনায়কতন্ত্র একাকার ... প্রথমবিশ্ব-তৃতীয়বিশ্ব একাকার।

বেশ তো, বুঝলাম, পাঞ্জাবের আঞ্চলিক দল অকালিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসবাদী ভিন্দ্রানওয়ালার জন্ম দিল কেন্দ্রীয় ক্ষমতাধিকারী। পরে আঞ্চলিক শক্তি অকালি দুর্বল হবার পর অপারেশন ব্লুস্টার, ভিন্দ্রানওয়ালাকেই নিকেশ করা। তৃতীয় বিশ্বের এই কৌশল, আর রুশ বিরোধী সাদ্দাম ও লাদেনের উত্থান, মার্কিন মদত; অবশেষে রুশ শক্তির পতনের পর সাদ্দাম আর লাদেনকেই খতম করা... একাকার। কিন্তু তাই বলে হিটলারের রাইখস্ট্যাগ পোড়ানো...।

কেন! রোজেনবার্গ দম্পতির ফাঁসি? সেও তো গণতান্ত্রিক মার্কিন মুলুক। ঠাণ্ডা লড়াই পর্ব। মার্কিন প্রশাসনের কমিউনিস্ট

বিরোধী হিস্টিরিয়া তখন তুঙ্গে! জুলিয়া আর এথেল রোজেনবার্গ সম্পূর্ণ মিথ্যা সাজানো মামলায় কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞের বলি। প্রধান রাজসাক্ষী হ্যারি গোল্ড আদালতে যেটা কবুল করে, সেটা এফবিআই-এর শেখানো। অপর পণ্ডিত ক্লাউস ফুকস মুক্তি পাওয়ার পর বলে, সে গোল্ডকে চিনতই না। মামলার বিচারপতি কাউফম্যানও অভিযোগের উর্ধ্বে নন। মামলার প্রথম থেকে আজ অবধি বিচারের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। বিশেষত ওয়াটার গেট মামলার পর প্রশ্নগুলো জোরালো হয়েছে। ডিমিট্রিভ তবু তো রাইখস্ট্যাগ ফায়ার ট্রায়াল থেকে মুক্তি পেয়েছিল, সেটা স্বৈরাচার। জুলিয়া ও এথেল রোজেনবার্গের সেই সুযোগও হয় নি, কারণ ওটা গণতন্ত্রের মক্কা। ৯/১১র তালিবান হামলার পর যেভাবে শোকের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো মুসলিম-প্রধান ও শিখ-প্রধান অঞ্চলগুলিতে সেটা 'ম্যানুফ্যাকচার্ড' বইকি... আফগান অভিযানের কনসেন্ট আদায়। ঠিক যেন ১৯৮৪, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর শিখ নিধন যজ্ঞ... খোদ কংগ্রেস সাংসদ অভিযুক্ত। কোনো পার্থক্য আছে মার্কিন গণতন্ত্র আর ভারতীয় গণতন্ত্রে! মার্কিন গণতন্ত্র ৯/১১র পরই চালু করে 'প্যাট্রিওটিক ল'। এটা সামরিক রাষ্ট্র গঠন ও জাতি রাষ্ট্র নির্মাণের পদক্ষেপ। অ্যান্ড্রু কলিনের মতে, সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে আমেরিকার কার্যকলাপকে সব প্রশ্নের উর্ধ্বে রাখতে হবে তো। অতএব সন্দেহ-ভয়-ভীতির-আশঙ্কার বাতাবরণ সৃষ্টি করা, 'ম্যানুফ্যাকচার' করা চলবে।

মনে হচ্ছে তুমি এডওয়ার্ড স্নোডেন ও 'প্রিজম স্পাইওয়্যার' সম্পর্কে বলতে চাইছো। জানো, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি বলেছেন, "আরো বারো বছর আগে যদি প্রিজম স্পাইওয়্যার ব্যবহার করা হতো তাহলে ৯/১১র জঙ্গি হামলা এড়ানো যেত"। ডিক চেনি কিন্তু একজন রিপাবলিকান নেতা; তাহলে? নিরাপত্তার প্রয়োজনে এটুকু ...।

শোনো, ডিক চেনি একজন ডেমোক্র্যাট নাকি রিপাবলিকান সেটা বিচার্য নয়। রাষ্ট্রক্ষমতার ধর্মনিরপেক্ষ মুখ প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদের উগ্রতার তাস খেলতে পারে, কাসভ-আফজল গুরুর ফাঁসি সে কথাই বলে। আবার হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্যোগে পাকিস্তানে মৈত্রী বাস-যাত্রা হবে, ট্রেন-যাত্রা হবে। এখানে কংগ্রেস-বিজেপি রিপাবলিকান প্রশ্ন চলে না... ক্ষমতার একটা নিজস্ব চলন আছে। অ্যান্ড্রু কলিন লিখেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আমেরিকায় এফবিআই-সিআইএ নিয়ন্ত্রিত পরিসরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলির ন্যূনতম অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বুশ জমানায় গণতন্ত্রের এই হত্যালীলা শীর্ষে পৌঁছায়। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদেরও মতামত অগ্রাহ্য করে আমেরিকাকে এক প্রসারিত সেনা ছাউনি রূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। একদা কমিউনিজম ও বর্তমানে টেররিজমের জুজু দেখিয়ে বুশ জমানায় এক চিরন্তন জরুরি অবস্থা জারি করার প্রয়াস চলে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ নয়, বরং দেশীয় প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র ও ভিন্ন স্বরগুলিকে স্তব্ধ করে দেওয়াই লক্ষ্য। আজকের নজরদারি বিতর্কের বীজ বপন হয়েছিল বুশ জমানায়।

বেশ, বুঝলাম। ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান, সকলেই উগ্র জাতীয়তাবাদী সামরিক রাষ্ট্রের সমর্থক। কিন্তু বুঝি না ৯/১১-র সন্ত্রাসবাদী হানায় সহস্রাধিক মানুষ মারা যাবে, তারপর সরকার আফগানিস্তান আক্রমণ করবে না, নজরদারি করবে না? তাহলে কী করবে?

প্রশ্নটা তুমি নিজেকেই করো না, তুমিই উত্তর দাও। মাস পয়লা বেতন নিয়ে বাড়ি ফিরছো। হঠাৎ বাসে দেখলে তোমার ব্যাগটা কাটা, ভেতর ফাঁকা, ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। তবু তুমি বাসের যাত্রীদের তল্লাসি নিতে পারো না। সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া পুলিশও ঘরে ঢুকতে পারে না। নাগরিক ও মানবিক অধিকার মানতে হবে তো। সুতরাং ৯/১১র ঘটনা যতই মর্মান্তিক হোক (ধরে নিচ্ছি ওই ঘটনা ম্যানুফ্যাকচার্ড নয়) সেই যুক্তিতে অপরের ঘরে উঁকি মারার অধিকার জন্মায় না। হ্যাঁ, কোনো মস্তান-সাংসদ-মন্ত্রী-বিধায়ক-প্রশাসক হয়তো বাস সমেত যাত্রীদের তল্লাশ নিতেই পারে। কিন্তু সেটা গণতন্ত্রের আচরণ নয়, ক্ষমতার আচরণ। তুমি বলছো, আফগানিস্তানে তালিবান দমন না করে কী করবে আমেরিকা। নিকারাগুয়া কী করেছিল? ১৯৮০র দশকে আমেরিকার সশস্ত্র হামলায় নিকারাগুয়ায় দশ সহস্র মানুষ মারা গেল। তারা আন্তর্জাতিক আদালতে গেল। আদালত আমেরিকান সরকারকে নিন্দা করে জানাল 'unlawful use of force'। আমেরিকা আরো বড়ো সামরিক হামলা চালাল। এবার নিকারাগুয়া নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ। নিরাপত্তা পরিষদ আদালতের নির্দেশ মেনে নেওয়ার নির্দেশ দিল। আমেরিকা ভেটো প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত মুলতুবি রাখলো। এরপর সাধারণ সভার দ্বারস্থ, সাধারণ সভাও একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটাই তো গণতন্ত্রের পথ, আইনের পথ। গায়ের জোরে আইনের নির্দেশকে উপেক্ষা করা, বদলা নেওয়া, মধ্যস্থতার পথ বর্জন করা গণতন্ত্র নয়। গণতন্ত্রে বহুস্বর স্বীকৃত, আর আমেরিকার ভাষ্যে এর হুমকি "Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists" এটা কোনোমতেই গণতন্ত্রের ভাষা হতে পারে না। 'হ্যাঁ' আর 'না' এর মধ্যে কোনো 'স্পেস' থাকবে না? এটা গণতন্ত্র! তৃতীয় বিশ্বে এমন হয়, তুমি সিঙ্গুরে টাটার কারখানা চাও না, অতএব তুমি শিল্পায়ন বিরোধী; তুমি উন্নয়ন বিরোধী। তুমি ইউএপিএ বিরোধী, অতএব তুমি মাওবাদী।

তোমার কথা মানছি। খুব উচ্চমার্গে পৌঁছে গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, প্রথম বিশ্ব, তৃতীয় বিশ্ব একাকার। কিন্তু সাধারণ ভাবে প্রাত্যহিক জীবনে দুর্নীতি-ভণ্ডামি-মিথ্যাচার এগুলো

সেখানে দেখতে হয় না; পয়সা দিয়ে অন্তত জনমত কেনা...।

আসলে তুমি পশ্চিমের ভালো গণতন্ত্রে মোহাচ্ছান্ন। তুমি পশ্চিমী গণতন্ত্রের উৎকর্ষতা মেনে নিয়েছ, তাই ওরকম ভাবছো। মাত্র কদিন হল ওবামার পুননির্বাচন শেষ হলো। সাধারণ মানুষের 'পছন্দ' অর্জনের জন্য ওবামা প্রশাসন ২০১১-২০১২ সালে ফেসবুক-টুইটার ইত্যাদি অনলাইন প্রচারে ব্যয় করেছে ৩৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। অথচ আর্থিক মন্দার কারণে সরকারি ব্যয়ে রাশ টানার কথা বলা হয়েছে। আর্থিক মন্দার সময়ে সরকারি অর্থে এই ছেলেখেলাকে ইন্সপেক্টর জেনারেলের দফতর সমালোচনা করেছে। কদিন আগে সংবাদে প্রকাশ, ভারতে খুচরো পণ্যের বাণিজ্যে ওয়ালমার্ট প্রবেশপত্র অর্জন করার লক্ষ্যে মার্কিন সেনেটে ঘুষ বাবদ খরচ করেছে ১২৫ কোটি টাকা। ওদিকে শুনছি ওবামা সরকার গত দশ বছর ধরে সিআইএ মারফত আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইকে অর্থ দিয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইন্টিগ্রিটি ওয়াচ আফগানিস্তানের রিপোর্টে প্রকাশ: অর্থ রাজকোষে জমা পড়েনি, এসেছে সিআইএ-র মাধ্যমে। অতএব কত টাকা এলো, কীসে খরচ হলো সবটাই অজানা। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য ইব্রাহিম পিরজাদা এই লেনদেনে জড়িত। মার্কিন অর্থেই আফগানিস্তানে দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত। ঘুষ খাওয়া, ঘুষ দেওয়া, সরকারি অর্থে নিজের 'পছন্দ' অর্জন সবই আছে ঝুলিতে। সর্বোপরি আছে 'নজরদারি'। নৈতিকতার ধার ধারে না মার্কিন প্রশাসন। এর আগে উইকিলিকসের জুলিয়েন অ্যাসেঞ্জ, এবার এডওয়ার্ড স্নোডেন মার্কিন দেশের নীতিহীন নজরদারি নিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে। ২৯ বছর বয়সী স্নোডেন মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মী, 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বলেন ''একবার প্রিজম স্পাইডার ঢুকে পড়লে কোন মেসিনে কে কী করছে তা জেনে ফেলা মুহূর্তের ব্যাপার।... আমি এমন জগতে বাস করতে চাই না যেখানে আমার প্রতিটি কথা ও কাজ রেকর্ড হয়ে চলেছে। আমেরিকার এই কুকর্ম ফাঁস করে আমি কোনো অপরাধ করিনি। একাধিক মানবাধিকার লঙঘনের সাক্ষী আমি। এই ভণ্ডামি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান জানাতেই এই কাজ করেছি।'' বিশ্বের মানবাধিকার রক্ষার স্বঘোষিত ঠিকাদারের একেবারে কাপড়ে চোপড়ে অবস্থা।

দাঁড়াও, থামো। স্নোডেন নিজে বলেছিল, ৩৫টি দেশে এই প্রিজম স্পাইডার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নজরদারি চলেছে। স্নোডেন সেই দেশগুলোর নামও করেন। তার লক্ষ্য ওইসব দেশে জামাই আদর লাভ করা। সত্যিই তাই; রুশ গুপ্তচর আন্না চ্যাপম্যান স্নোডেনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। ভ্লাদিমির পুতিনের জামাই আদর সুনিশ্চিত। বারাক ওবামা বরং স্পষ্ট বলেছেন, ''স্নোডেনের মতো ২৯ বছর বয়সী হ্যাকারকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই''। হ্যাকার প্রত্যর্পণ নিয়ে চিন বা রাশিয়ার সাথে কোনো বাগবিতণ্ডায় জড়াতে চান না, সম্পর্কের অবনতিও চান না। এ নিয়ে পত্রপত্রিকার যত মাথাব্যথা, আষাঢ়ে গল্প।

ঠিকই, আষাঢ়ে গল্প! ৪ঠা জুলাই, ২০১৩; আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসের বিমানে স্নোডেন আছে এই অভিযোগে মোরালেসের বিমান ১৪ ঘণ্টা অষ্ট্রিয়ায় আটকে থাকল। সাংবাদিক সম্মেলনে ইকুয়েডর-উরুগুয়ে-ভেনজুয়েলা-আর্জেন্টিনা-সুরিনামের নেতারা স্পষ্ট জানায় এই অপমান বলিভিয়ার নয়, সমগ্র লাতিন আমেরিকার। মোরালেস বলেন, ''মার্কিন দূতাবাস বন্ধ করে দিতে আমার হাত কাঁপবে না। আমেরিকা ছাড়াও সমগ্র লাতিন আমেরিকার স্বতন্ত্র পরিচয় আছে।'' ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট রাফায়েল কোরীরা বলেন, ''আমেরিকা যদি ভাবে তারা ইচ্ছেমতো আন্তর্জাতিক আইন ভাঙবে, তারা ভুল ভাবছে। এই ঘটনা যদি মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে ঘটতো, তাহলে এতক্ষণ যুদ্ধ লেগে যেত।'' ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরা বলেন, ''এই ঘটনার পেছনে সিআইএ-র হাত আছে''। এরপরও তুমি বলবে, ''হ্যাকারকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই''। মার্কিন প্রশাসনের মাথা বিগড়ে গেছে স্নোডেনকে নিয়ে। তার প্রদত্ত সব অভিযোগ ও তথ্যই সত্য। উইকিলিকসের জুলিয়েন অ্যাসেঞ্জ মার্কিন দখলদারি ও নৃশংসতার অজস্র তথ্য ফাঁস করে এখন আত্মরক্ষার জন্য লন্ডনস্থ ইকুয়েডর দূতাবাসে আশ্রিত। বাইরে বৃটিশ পুলিশ গ্রেফতারের অপেক্ষায়। ভিতরে বদ্ধ জীবনে অ্যাসেঞ্জ। মাথা ঘামাতে হচ্ছেই আমেরিকাকে, মুখে যাই বলুক।

তবে আর কী। তৃতীয় বিশ্ব বা প্রথম বিশ্ব, কোথাও গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র মিলে মিশে একাকার... অধিকার-আইন লঙঘন একমাত্র সত্য। তাত্ত্বিক গণতন্ত্র শুধু কিতাবের পৃষ্ঠায়। বাস্তবে অস্তিত্বহীন।

ঠিক তাই। একদম গোড়ার সত্যটা বলেছ তুমি। লক্ষ্য করো, সমস্ত গণতান্ত্রিক সংবিধানেই জরুরিকালীন একনায়কতান্ত্রিক বন্দোবস্তের সুযোগ থাকে। প্রথম বিশ্বের গণতন্ত্রে আপাতভাবে অধিকারগুলি বেশি। কারণ উপনিবেশের গণতন্ত্র, তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্র-অধিকার যে হারে লঙঘন হবে সেই হারে প্রথম বিশ্বে অধিকার সুরক্ষিত হবে। বেশি বলে মনে হবে। যখন তৃতীয় বিশ্বে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হবে, প্রথম বিশ্বের অধিকারে হাত পড়বে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে পুঁজির মধ্যে একটা নিয়ন্ত্রণহীন হবার প্রবণতা আছে।। মনে নেই, জার্মানির সামরিক জঙ্গি একনায়কতন্ত্র মাত্র কুড়ি বছরে (১৮৭০-৯০) ব্রিটেনের একশ বছরের শিল্প বিপ্লবকে স্পর্শ করে। লেনিনও সোভিয়েত শিল্পায়নে জার্মানির সামরিক একনায়কতন্ত্রের শিল্পায়ন মডেল গ্রহণ করেন দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে। পুঁজি চায় অনিয়ন্ত্রিত রাজনীতি। গণতন্ত্র হল 'পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণের মুখোশ' আঁটা একনায়কতন্ত্র। বিপাকে পড়লে তখন এই ন্যূনতম, মুখোশটুকুও ধরে রাখা যায় না, খসে

পড়ে। সম্প্রতি যেমন আর্থিক মন্দার ঝাপট খোদ মার্কিন মুলুকের ঘুষ-দুর্নীতি-চরবৃত্তি-অধিকারহনন সার্বিক অনৈতিক কাজকর্মকে প্রকাশ করছে। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন লিখেছেন— অস্ট্রিয়ার হাবসবার্গ সাম্রাজ্য ছিল বহুজাতিক। ফলে চান্সেলর মেটারনিখ মিথ্যা জাতীয়তাবাদকে প্রতিরোধ করতে সদা যত্নবান ছিলেন। প্রতিবেশী দেশেও জাতীয়তাবাদ প্রতিরোধে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। প্রাশিয়ার রাজা একটি উদারনৈতিক সংস্কারে উদ্যোগ নিলে মেটারনিখ মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে প্রাশিয়ার রাজাকে সংস্কার থেকে বিরত রাখে। রুশ জার পোল্যান্ডকে কিছু স্বায়ত্তশাসন দানে উদ্যোগ নিলে মেটারনিখ সেই উদ্যোগে বাধা দেন। পার্মার রাণী মেরী লুইয়ের সাথে এক সেনা অফিসারের সম্পর্ক নিয়ে রাণীকে ব্ল্যাকমেল করে সংস্কার থেকে বিরত রাখে। মেটারনিখের আপাত নির্দোষ প্রস্তাব অনুযায়ী ইউরোপের ডাক ব্যবস্থা ভিয়েনার মাধ্যমে চালু হয়। ভিয়েনা হল সদর দপ্তর। মেটারনিখ ভিয়েনাতে সমস্ত চিঠি খোলা, পাঠোদ্ধার, চিঠি পুনরায় সিল করা ও উদ্ধৃত তথ্য মেটারনিখের কাছে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন। ওটা ছিল রক্ষণশীল হাবসবার্গ সাম্রাজ্য। এডওয়ার্ড স্নোডেন প্রকাশিত প্রিজম স্পাইওয়্যার হলো গণতান্ত্রিক মার্কিন মুলুকে। এবার তো মানবে, গণতন্ত্র-অভিজাততন্ত্র-একনায়কতন্ত্র শুধু নামগত ও শব্দগত পার্থক্য, মূলগত নয়। কি? এখনও খড় দেখতে পাচ্ছো না?

[সংবাদে প্রকাশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য জার্মানি-ইতালি মার্কিন নজরদারির বিরোধিতা করেছে। তবে ব্রিটিশ বিদেশ সচিব উইলিয়াম হেগ বলেন, ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা (গর্ভর্নমেন্ট কমিউনিকেশন হেডকোয়ার্টার) ও মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা (ন্যাশনাল সিকিওরিটি এজেন্সি)-র মধ্যে তথ্য লেনদেনের ফলেই ২০১২র লণ্ডন অলিম্পিক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। উৎসাহী ওবামা প্রশাসন জানিয়েছে দরকার হলে নজরদারি আরো কঠোর হবে।]

'এত মাওবাদী কেন?'

১৭ পৃষ্ঠার পর

গড়ে তুলেছে, যেখানে রাষ্ট্রের চোখে শাসকদলের চোখে প্রশাসনের চোখে 'মাওবাদী' হতে গেলে সিপিআই(মাওবাদী) দলের রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্র/শাসকদল/প্রশাসনের অপছন্দের তালিকায় থাকাটাই যথেষ্ট। রাষ্ট্র তার সুবিধার্থে তাকে 'মাওবাদী' বানিয়ে নেবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছুদিন 'ওরা সিপিএম' এই যুক্তি দিয়ে যা খুশি করার সুবিধা ভোগ করেছে। ৩৪ বছরের সিপিআইএম-এর অত্যাচার সন্ত্রাসের স্মৃতিতে মানুষের কাছে 'সিপিআইএম' নামটা একটা ঘৃণা-বিমিশ্রিত পরাজিত দানব হিসাবেই ভেসে উঠত। তারপর সময়ের সাথে এই ছবিটার রঙ ফিকে হয়েছে। এখন আর ঐ ছবিতে খুব বেশি কাজ হচ্ছে না। তাই এখন দরকার আরও একটা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। বর্তমান সরকার 'মাওবাদী' শব্দাতঙ্ককেই বেছে নিচ্ছে। জমি তৈরিই ছিল। শুধু একবার দেগে দেওয়া। এটাও যদি গা-সওয়া হয়ে যায় তখন হয়তো বলবে পাকিস্থান বা আইএসআই-এর চর। তারপর আর আইন, নৈতিকতা বা প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন কেউ তুলতে সাহস পাবে না। যদি পায়ও তাহলে সেও নিশ্চিত আইএসআই-এর চর। প্রতিবাদ করতে গেলেই যদি এত বাঘা-বাঘা চাপ সইতে হয়, সমাজ আপনি শান্ত থাকবে। ধর্ষিতা নারীই থানায় অভিযোগ জানানোর মতো গুরুতর চক্রান্ত করতে সাহস পাবে না তো বিরোধী রাজনীতি। জীবন-জীবিকা-জল-জমি— যে প্রশ্নেই লড়াই হোক না কেন— রাষ্ট্র তাদের 'মাওবাদী' বানিয়ে দেবে। তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময় ভুলে চলবে না সেই চির পরিচিত সতর্কবার্তা—

"ওরা যখন কমিউনিস্টকে ধরে নিয়ে গেল..."

মার্কিন দেশের বিচারের হালচাল!

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০১২। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস হওয়ার প্রায় এক দশক পার। কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর ট্রেভন মার্টিন মার্কিন দেশের ফ্লোরিডায় এক বর্ষাস্নাত রাতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক শ্বেতাঙ্গ যুবক জর্জ জিমারম্যান, ট্রেভনের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। জিমারম্যানের যুক্তি অতি সরল: ৯/১১-এ বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে আক্রমণের পর শ্বেতাঙ্গ হিসেবে সে এতটাই ভীত যে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ দেখেই তার মনে হয় এই বুঝি কালো চামড়ার 'সন্ত্রাসবাদী' তার পিছু নিয়েছে! হত্যা মামলায় মার্কিন আদালতে এই হাস্যকর যুক্তিই ছিল তার সওয়াল।

মহামান্য মার্কিন আদলত রায় দেন- জিমারম্যান উচিত কাজই করেছেন। আত্মরক্ষার জন্য নিরস্ত্র নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা 'ন্যায্য'। জিমারম্যানের বাবা-মা আদালতে অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু আদালতে এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য তাদের জরিমানা দিতে হয়।

নিউইয়র্ক থেকে বোস্টন, লস এঞ্জেলস প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বত্র কৃষ্ণাঙ্গরা এই রায়ের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছেন- সঙ্গে যোগ দিয়েছেন গণতন্ত্রপ্রিয় বহু শ্বেতাঙ্গ মানুষ।

প্রবন্ধ

অধিগ্রহণ— উন্নয়ন না লুঠের হাতিয়ার

সাম্প্রতিক কয়েকটি সমীক্ষার আলোকে

প্রণব দে

সিঙ্গুর নিয়ে মানুষের কৌতূহল এখনও প্রবল। নাগরিক ও বৌদ্ধিক সমাজের একাংশ এখনও মনে করে, টাটাদের তাড়িয়ে সিঙ্গুরের মানুষ নিজেদের পয়ে কুড়ুল মেরেছে। পণ্ডিত মশাইরা যাই বলুন, ভুক্তভোগীরা অন্য কথা বলে। দেশের সাধারণ ভূমিজীবী মানুষের বিশ্বাস, ভিটেমাটি, জীবন-জীবিকার উৎস থেকে উচ্ছেদ করা ছাড়া অধিগ্রহণ তাদের কোন উপকার করতে পারেনি। সিঙ্গুর থেকে উচ্ছেদ-বিরোধী বিক্ষোভ সারা দেশে ছড়িয়েছে। জনজীবনে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বিতর্ক উঠেছে সংসদে।

বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু একটাই। জনস্বার্থের নামে বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য যে অধিগ্রহণ, তাতে জনতার স্বার্থ প্রকৃত অর্থে কতটা রক্ষিত হয়। এখন অধিগ্রহণের যে প্রক্রিয়া সরকার অনুসরণ করে, তাতে অনেক ক্ষুদ্র কৃষক বা ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি সরকার তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করে ও তারপর বৃহৎ কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সমর্পণ করে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সেই জমিতে শিল্প হতে পারে, আবাসনও হতে পারে। এমনকি শপিংমল-কমপ্লেক্স হতেও বাধা নেই। পরিবর্তে জমির মালিক পায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ। আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জমির বাজার দামের উপর ৩০ শতাংশ 'সোলেসিয়াম'। জীবিকাচ্যুত, বাস্তুচ্যুত জমির উপর নির্ভরশীল অন্যান্য মানুষগুলির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ নেই। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমির ক্ষেত্রে বর্গাদারদের জীবিকা হারানোর মূল্য তাদের প্রাপ্য ফসলের বড়জোর ছয়গুণ দাম।

সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে সরকার কিছু ব্যতিক্রমী ঘোষণা করেছিল। জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা করা হবেনা, এই মুচলেকা দেওয়ার শর্তে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল। এটাকে বলা হয়েছিল 'কনসেন্ট এ্যাওয়ার্ড'। বর্গাদারদের নির্দ্দিষ্ট জমির ক্ষতিপূরণ অঙ্কের ২৫ শতাংশ প্রদানের ঘোষণা করা হয়েছিল। এই অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ সিঙ্গুরের ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল। রাজারহাট সহ অন্যত্র কোথাও মূল আইনের বাইরে কোন অর্থ প্রদান করা হয়নি। কিন্তু এই বাড়তি ক্ষতিপূরণেও সিঙ্গুরের কৃষকদের বিক্ষোভ কেন প্রশমিত হয়নি, সেটা উন্নয়ন-পণ্ডিতদের কাছে সম্ভবত এক মস্ত ধাঁধাঁ। সম্প্রতি সিঙ্গুরে এক যৌথ ক্ষেত্র-সমীক্ষার[১] মাধ্যমে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা প্রমাণ করেছেন যে টাটা মোটর্স প্রকল্পে কৃষিজমি অধিগ্রহণ ''কৃষক, বর্গাদার এবং কৃষিশ্রমিকদের ঘাড়ে যথেষ্ট আর্থিক ক্লেশ চাপিয়ে দিয়েছে''। অধিগ্রহণ যে সাধারণভাবে কৃষিজীবীদের জীবনযাত্রায় অবনতি ঘটায়, সেটা পশ্চিম মেদিনীপুরে খড়গপুর অঞ্চলে অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে অভিজিৎ গুহের সমীক্ষাতেও প্রমাণিত হয়েছে। সে আলোচনায় আমরা পরে আসব। আগে সিঙ্গুর।

অধিগৃহীত অঞ্চলে কৃষিবিন্যাস

মৈত্রীশ ঘটক ও অন্যান্যদের উক্ত সমীক্ষায় প্রদত্ত তথ্যানুসারে অধিগ্রহণের পূর্বে, ২০০৫ সালে, সংশ্লিষ্ট ছয়টি গ্রামে[২] কৃষিজীবীদের প্রায় সবাই ছিলেন প্রান্তিক অথবা ক্ষুদ্র কৃষক। ৯০ শতাংশ পরিবারেরের প্রধান জীবিকা ছিল দিনমজুরি। শ্রমিক পরিবারগুলির অনেকেই ক্ষুদ্র কৃষিজোতের মালিক। পরিবার-প্রধান কৃষি বা অকৃষি শ্রমিক হলেও, পরিবারের অন্যান্যরা হয়তো স্বজোতে চাষ-আবাদ করতেন। অধিগ্রহণের পূর্বে কৃষক-স্বত্বাধিকারী হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন ১০ শতাংশ পরিবার। তাদের ৫৯ শতাংশের জমি টাটা মোটর্সের কবলিত হয়। মোট এক-তৃতীয়াংশ পরিবার অধিগ্রহণে জমি হারিয়েছিল। অধিগৃহীত হয়েছিল ৫০ শতাংশ কৃষিজমি। সংখ্যার এবং পরিমাণের বিচারে অধিগ্রহণে গ্রামীণ-শ্রমিক পরিবারগুলি সবথেকে বেশি জমি হারিয়েছিলেন (সারণী-১)[৩]।

অসন্তোষের বিস্তার:

জমি যাদের গিয়েছিল, তাদের ৯০ শতাংশই প্রান্তিক কৃষক। ৯ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষক। মধ্য কৃষক মাত্র ১ শতাংশ। সমীক্ষাভুক্ত পরিবারগুলির অর্দ্ধেকের বেশি ছিল 'অনিচ্ছুক' পরিবার (সারণী-২)। অধিগৃহীত জমির প্রায় ৬০ শতাংশ এই 'অনিচ্ছুক' (ক্ষেত্র-সমীক্ষায় unwilling শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে) পরিবারগুলির দখলে ছিল। কৃষক যে গোষ্ঠীর হোক না কেন, 'অনিচ্ছার' বিস্তার ছিল সর্বত্র। সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৫৬ শতাংশ জমিতে ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। 'অনিচ্ছুক' চাষীদের বিষয়টা যাঁরা এতদিন নিতান্তই বানানো গল্প বলে প্রচার করে এসেছেন, বিশেষজ্ঞদের সিঙ্গুর সমীক্ষার পর্যবেক্ষণ কিন্তু সেই সমস্ত তাত্ত্বিকদের বক্তব্য নস্যাৎ করে দিচ্ছে। 'অনিচ্ছুক' শব্দটির আইনগত কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু বাস্তব চাহিদাগুলো তো আর আইন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়না।

জীবিকার উপর অধিগ্রহণের প্রভাব

কৃষিজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের প্রভাব আদৌ সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। সাধারণ মানুষের উপার্জনে তারতম্য বোঝার জন্য সমীক্ষায় ভুক্তভোগী পরিবারগুলির সঙ্গে অধিগ্রহণ বহির্ভূত পরিবারগুলির আয়ের হ্রাস/বৃদ্ধির তুলনা

সারণী- ১: অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির কৃষিজীবী পরিবারগুলির সার্বিক বিন্যাস

পরিবার প্রধানের জীবিকা	পরিবার সংখ্যা	২০০৫ সালে জমির পরিমাণ (একর)	অধিগৃহীত নিজ জোত		অধিগৃহীত বর্গা জোত		বাস্তু অধিগ্রহণ (পরিবার)	মোট অধিগ্রহণ (তুলনীয় অংশ)	
			পরিবার	জমি	পরিবার	জমি		পরিবার	জমি
কৃষক-স্বত্বাধিকারী	৬১৭ (১২%)	৫৪৭.০০ (৩৩%)	৩৩০	১৬৯.৬৮	৩১	২৫.৩৭	২	৩৬৩ (৫৯%)	১৯৫.০৫ (৩৬%)
কৃষিশ্রমিক	১৫৭৭ (৩১%)	২৯৪.২৬ (১৮%)	৩৯৪	১৪৮.৬৫	৪৫	৪৫.৩৭	১৬	৪৫৫ (২৯%)	১৯৪.০২ (৬৬%)
অকৃষিশ্রমিক	১৩৬১ (২৭%)	৩৩১.২৩ (২০%)	৪৩৭	১৩৫.৬৭	২৪	৬২.৬৪	৭	৪৬৮ (৩৪%)	১৯৬.৩১ (৫৯%)
অন্যান্য	১৫০১ (৩০%)	৪৭৪.২৩ (২৯%)	৪২৭	১৬৮.৩৬	২৪	৫৮.৮২	১	৪৫২ (৩০%)	২২৭.১৮ (৪৮%)
মোট	৫০৫৬ (১০০%)	১৬৪৬.৯৯ (১০০%)	১৫৮৯	৬২৩.০৯	১২৪	১৯২.২০	২৬	১৭৩৯ (৩৪%)	৮১৫.২৯ (৪৯.৫%)

করা হয়েছে। অধিগ্রহণ-ভুক্ত পরিবার এবং অধিগ্রহণ-বহির্ভূত পরিবারগুলির আয়ের ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক ঘটে যায়। ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে অধিগ্রহণ-ভুক্ত কৃষক পরিবারগুলির কৃষি থেকে আয় ১২.৭৪ শতাংশ হ্রাস পায়। সেই একই সময়ে অধিগ্রহণ বহির্ভূত কৃষকদের আয় বৃদ্ধি হয়েছিল ১৮-২০ শতাংশ। ঐ সময়কালে কৃষি শ্রমিকদের আয় সার্বিকভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু অধিগ্রহণ সংযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি-হ্রাসের মাত্রা ছিল অনেক বেশি। একমাত্র অকৃষি শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে কিছুটা বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল (সারণী-৩)।

অধিগৃহীত জমি থেকে অধিগ্রহণের পূর্বে সিঙ্গুরের কৃষিজীবী মানুষের ঐ জমি থেকে কতটা আয় ছিল, সে সম্বন্ধে পৃথক এক সমীক্ষা হয়েছিল বাজেমেলিয়া, খাসেরভেড়ি এবং বেরাবেরি মৌজায়, ২০০৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে[৪]। সেই সমীক্ষার পর্যবেক্ষণে অধিগৃহীত কৃষিজমিতে ২০০৫ সালে প্রায় ২০ শতাংশের আয় ছিল বছরে ১ লক্ষ টাকার বেশি, ২৭ শতাংশের আয় ছিল ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকার মধ্যে, ৩৬ শতাংশ আয় করেছিল ১০-২০ হাজার টাকা, ১৭ শতাংশের উপার্জন ছিল তার কম। ৫০ শতাংশের বেশি কৃষিশ্রমিক/ বর্গাদারদের বার্ষিক আয় ১০ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যেত।

এটা লক্ষণীয়, সিঙ্গুর অধিগ্রহণে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে প্রান্তিক কৃষক সম্প্রদায়। সিঙ্গুরে এই সম্প্রদায়ের কৃষকেরই সংখ্যাধিক্য। জমি তাদেরই বেশি গেছে। মজুরির ক্ষেত্রেও তারা মার খেয়েছে। সংখ্যাধিক্য মানুষের এত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, ঝড় তো উঠবেই।

সুতরাং সিঙ্গুরের কৃষকদের বিক্ষোভ অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোন কারণ নেই। সম্ভাব্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কাই সিঙ্গুরের কৃষকদের বিক্ষোভে সমবেত করেছিল। মাটিতে যারা বাস করে, বিপর্যয়ের সঙ্কেত তারাই সর্বাগ্রে পায়। এটা প্রাকৃতিক বিধান। আধুনিক উন্নয়ন-পণ্ডিতরা যা অনুমান করতে পারেন নি, সিঙ্গুরের কৃষকরা তার আঁচ পেয়েছিল অনেক

সারণী ২: জোতের বিচারে অধিগ্রহণ সমীক্ষা

২০০৫ সালে জোতের পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট পরিবার (সংখ্যা)	মোট পরিবারের শতাংশ	অধিগৃহীত (একর)	অনিচ্ছুক জমির শতাংশ	অনিচ্ছুক পরিবার	অনিচ্ছুকদের শতাংশ
০.৫০-এর কম	১৪০	৪০	২৩.৭৯	১৩	৬৫	৪৬%
০.৫০-১.০০	১০২	২৯	৩৮.৮০	২২	৫৭	৫৬%
১.০০-২.০০	৭৪	২১	৫৬.৭৯	৩২	৩৯	৫৩%
২.০০-৩.০০	১৮	৫	২৭.০৭	১৫	১১	৬১%
৩.০০-৫.০০	১৪	৪	২২.৫৬	১৩	৭	৫০%
৫.০০-এর বেশি	৩	১	৯.৩৪	৫	১	৩৩%
মোট	৩৫১	১০০	১৭৮.৩৫	১০০	১৮০	৫১%

সারণী ৩:
উপার্জনের ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের প্রভাব (২০০৫-২০১০)

	অধিগ্রহণ-ভুক্ত পরিবার	*অধিগ্রহণ-বহির্ভূত পরিবার*
	আয়ের গড় হ্রাস/বৃদ্ধি (শতাংশ)	
ক) কৃষি-আয়ের পরিবর্তন		
কৃষক স্বত্বাধিকারী	-১২.৭৪	১৭.৯৯
নিজ জমি সহ লীজ নেওয়া জমির কৃষক	৪.৭৮	২০.৪২
খ) মজুরি-আয়ের পরিবর্তন		
কৃষি- শ্রমিক	-২২.৩	-১৩.৯৮
অকৃষি- শ্রমিক	৩৩.৫৭	৩০.১২

আগেই। পাশাপাশি এটাও লক্ষণীয়, যে অঞ্চলে অধিগ্রহণ থাবা বিস্তার করেনি, সেই অঞ্চলে কৃষি-আয় বৃদ্ধি এটাই প্রমাণ করে যে, কৃষির পরিকাঠামো যদি ধ্বংস না করা হয়, যেটা অধিগৃহীত অঞ্চলে হয়েছিল, কৃষি থেকে আয় বৃদ্ধি এবং জীবিকা নির্বাহ এখনও সম্ভব।

ক্ষতিপূরণে ক্ষতি

টাটা কোম্পানির জন্য অধিগ্রহণের সাফাই দিতে গিয়ে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম যুক্তি ছিল, সিঙ্গুরে যা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, ভূভারতে নাকি তা দেওয়া হয়নি। এই দাবিটা ঠিক নয়। কেননা, অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তার লাভ করার পর প্রতিটি রাজ্য সরকারই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে কৃষকদের তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার থেকে বড়ো প্রশ্ন, বাস্তবতার সঙ্গে সরকার প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের যোগ কতটুকু? সিঙ্গুরে কৃষিজমির দুটো শ্রেণী। সর্বোত্তম উর্বর এবং বহুফসলি জমিকে বলা হয় 'শুনা'। তুলনামূলকভাবে কম উর্বর জমিকে বলা হয় 'শালি'। সরকারি ভাষ্যে 'শালি' জমি একফসলি হিসাবে চিহ্নিত হলেও, বাস্তবে এই জমিতেও একাধিকবার চাষ হয়। সরকার 'শালি' জমির মূল দাম নির্ধারণ করেছিল একর প্রতি ৬.০২ লক্ষ টাকা এবং 'শুনা' জমির জন্য একর পিছু ৮.৮০ লক্ষ টাকা। সোলেসিয়াম, সুদ, কনসেন্ট এ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি সহযোগে, সরকারি হিসাবে, শালি জমির জন্য প্রদেয় মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল একর পিছু ৮.৭০ লক্ষ টাকা এবং শুনা জমির জন্য একর পিছু ১২.৭৬ লক্ষ টাকা।[৫] সরকারের হিসাবে টাটা প্রকল্পে অধিগৃহীত শালি জমির পরিমাণ ছিল ৯০০.২০ একর এবং শুনা জমি মাত্র ৩৬.৫৭ একর। অর্থাৎ শালি ও শুনা জমির অনুপাত ছিল ৯৬:৪। হুগলী জেলার যা কৃষিচরিত্র, তার সঙ্গে সরকারের এই হিসেব একেবারেই খাপ খায়না। সরকারি নথিপত্রেই বিবৃত হয়েছে, এই জেলায় ৮২ শতাংশ কৃষি জমিই বহুফসলী। টাটা কারখানার জন্য অধিগ্রহণের সময়ে হিসাবটা একেবারে উল্টো হয়ে গেল। ফল যেটা হয়েছে, কৃষকরা জমির গুণমান অনুযায়ী প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ পাননি। শুনার বদলে শালি জমির দাম পেয়েছেন।

সমীক্ষাতে বিষয়টি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। যে স্বত্বলিপির ভিত্তিতে জমির শ্রেণী বিচার করা হয়েছে, তা সাম্প্রতিক তথ্য নয়। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন পুরোনো রেকর্ড। সমীক্ষকরা জমির মালিকদের সরেজমিনে জিজ্ঞাসাবাদ করে জমির শ্রেণী এবং প্রচলিত বাজারদর সম্বন্ধে যে তথ্য পেয়েছিলেন, তাতে দেখা যায়, সাধারণ মানুষের উপলব্ধি এবং সরকারি তথ্যের মধ্যে ব্যাপক গরমিল (সারণী-৪)। সরকারি তথ্য সিঙ্গুরে মাত্র ৪ শতাংশ শুনা জমির অস্তিত্ব স্বীকার করলেও, কৃষকদের অভিমতে তার পরিমাণ সিঙ্গুরের কৃষিজমির ৩৮ শতাংশ।

সংশ্লিষ্ট জমি-মালিকদের মধ্যে সমীক্ষা করে জানা যায়, শুনা জমির জন্য সরকার প্রদত্ত প্রকৃত ক্ষতিপূরণের হার ছিল একর প্রতি ৮.৩-৮.৮ লক্ষ টাকা। সেই সময়ে এই জমির বাজার দর ছিল একর প্রতি ৮.৭-৯.০ লক্ষ টাকা। শালি জমির জন্য সরকার প্রদত্ত প্রকৃত ক্ষতিপূরণের হার ছিল একর প্রতি ৮.৮-৯ লক্ষ টাকা। বাজার দর ৮.৩-৮.৬ লক্ষ টাকা। শুনা জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের মাত্রা স্পষ্টত বাজার দরের থেকে কম। সরকার ঘোষিত ক্ষতিপূরণের হারের থেকে কম তো বটেই এবং সেটা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম। শালি জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বাজার দর এবং সরকার ঘোষিত হারের থেকে সামান্য বেশি। সম্ভবত

সারণী ৪: সরকারি তথ্য এবং বিভিন্ন পরিবার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিচারে সিঙ্গুরের জমির চরিত্র

জমির শ্রেণী	*সরকারি পরিসংখ্যান অধিগৃহীত জমি*				*নমুনা সমীক্ষা প্রাপ্ত তথ্য- নিজ দখলি জমি অধিগৃহীত জমি*			
	*দাগের সংখ্যা**	*শতাংশ*	*পরিমাণ (একর)*	*শতাংশ*	*দাগের সংখ্যা**	*শতাংশ*	*পরিমাণ (একর)*	*শতাংশ*
শালি	১২৯৮০	৯৪.৩	৮৭৩.২	৯৬.১	৫৭০	৬১.০	৮২.৩২	৬২.১
শুনা	৭৮৮	৫.৭	৩৫.৪	৩.৯	৩৬৫	৩৯.০	৫০.১৫	৩৭.৯
মোট	১৩৭৬৮	১০০	৯০৮.৬	১০০	৯৩৫	১০০	১৩২.৪৭	১০০

* জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ বা Plot-এ বিভক্ত থাকে

কনসেন্ট এ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি কিছু অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের কারণে এই পার্থক্যটা দেখা যাচ্ছে। এ সব সত্ত্বেও, যাঁরা কম পেয়েছেন, তাঁদের লোকসান এবং সংখ্যাগত গুরুত্ব এত বেশি যে, সামান্য বাড়তি দিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ উপশম করা যায়নি।

আর একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা: মেদিনীপুর

মোটের উপর, সিঙ্গুরে অধিগ্রহণের ফলে জমিহারা কৃষক এবং জীবিকাহারা মজুর সম্পদ এবং আর্থিক বিচারে যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলে, সে বিষয়ে সমীক্ষকরা সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। অধিগ্রহণ সামগ্রিকভাবে অধিগৃহীত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কিরূপ অবনতি ঘটায়, সেটা পশ্চিম মেদিনীপুরে খড়গপুর অঞ্চলে ছয়টি মৌজার এক ক্ষেত্রসমীক্ষায় (১৯৯৫-৯৭) অধ্যাপক অভিজিৎ গুহ দেখিয়েছিলেন[৬]। বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের প্রথমার্ধে, পশ্চিম মেদিনীপুরে খড়গপুর অঞ্চলে, 'টাটা মেটালিক' সহ বিভিন্ন কোম্পানির জন্য বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই প্রান্তিক কৃষক এবং জনসংখ্যার এক বড়ো অংশ আদিবাসী। অধ্যাপক গুহ তাঁর নমুনা সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, অধিগ্রহণের আগে যেখানে ভূমিহীন কৃষকের অস্তিত্ব ছিলনা, অধিগ্রহণের পর তাদের আবির্ভাব হলো। অতি-প্রান্তিক পরিবারের অনুপাত দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল এবং ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকদের সংখ্যা হ্রাস হলো। ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিবারগুলির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারেনি কিন্তু প্রান্তিকতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল (সারণী-৫)।

অধিগ্রহণের পরিণতি

ধ্বংস ও লুণ্ঠন পুঁজি সঞ্চয়ের আবাল্য সঙ্গী। পুঁজিবাদী সভ্যতা এগিয়েছে এই দুই ছায়াসঙ্গীকে সাথী করে। আধুনিক উন্নয়নের মূল সুরকার পুঁজিপতিদের সিন্ডিকেট। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো তারা উন্নয়নের সুর তুলছে আর বিত্তদর্পী নাগরিক সমাজকে সেই সুরের মায়াজালে নাচাচ্ছে। উন্নয়ন এখন ব্যবসা। ব্যবসার পুঁজি সংগৃহীত হচ্ছে অধিগ্রহণের মাধ্যমে। প্রান্তবাসীদের সম্পদ লুঠের বিনিময়ে উৎপন্ন হচ্ছে ভোগবাদীদের সম্পদ। জনস্বার্থের নামে চলেছে উচ্ছেদ অভিযান। স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন অভিঘাতে অধিগৃহীত হয়েছে ৪৮ লক্ষ একর, উচ্ছেদ হয়েছে ৭০ লক্ষ মানুষ। উচ্ছিন্ন মানুষের ৫০ শতাংশই আদিবাসী এবং দলিত সম্প্রদায়ের। তাদের মাত্র ৯ শতাংশের কিছু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাও সেটা একেবারে গোড়ার দিকে। ভারতে পঞ্চাশ বছরে উচ্ছেদ হয়েছিল ৬ কোটি মানুষ। এখন যে উন্নয়ন পর্ব চলছে, তাতে *সেজ*, সুপারহাইওয়ে, খনি অধিগ্রহণে উচ্ছেদ হবে কম করেও ১.৫ কোটি মানুষ। নদী-সংযুক্তি প্রকল্পে আরও প্রায় ১৫ লক্ষ। আগামী দশ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কমবেশি ২ কোটি মানুষের উচ্ছেদ নিশ্চিত।[৭]

সারণী ৫: অধিগ্রহণের আগে ও পরে কৃষিজোতের বিন্যাস

জোতের আয়তন (একর)	*অধিগ্রহণের আগে*		*অধিগ্রহণের পর*	
	সংখ্যা	*শতাংশ*	*সংখ্যা*	*শতাংশ*
ভূমিহীন	০	০	২২	১৫.২৮
০.৫-এর কম	১৯	১৩.১৯	৩৫	২৪.৩১
০.৫-১.৫	৫৮	৪০.২৮	৫১	৩৫.৪২
১.৫-২.৫	৩২	২২.২২	১৪	৯.৭২
২.৫-৩.৫	১৩	৯.০৩	১৩	৯.০৩
৩.৫-৪.৫	৮	৫.৫৬	৫	৩.৪৭
৪.৫-৫.৫	৬	৪.১৭	৩	২.০৮
৫.৫-৬.৫	০	০	১	০.৬৯
৬.৫-৭.৫	৮	৫.৫৫	০	০
মোট	১৪৪	১০০	১৪৪	১০০

এই কাজটাই পরিকল্পিত উপায়ে করার জন্য সংসদে নতুন একটি বিল অপেক্ষমান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ যতই বলুন, নতুন বিলে অধিগ্রহণকে মানবিক করা হয়েছে, আসলে কর্পোরেট পুঁজির হাতে সাধারণ মানুষের সম্পদ উৎসর্গ করার ব্যবস্থা পাকা করা হচ্ছে। একটা প্রশ্ন উঠেছে, ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কানাডা ইত্যাদি উন্নত দেশে রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণের বদলে প্রতিষ্ঠানগুলি যদি জমি কিনে নিতে পারে, ভারত কেন এই একবিংশ শতাব্দীতে এই বৈষম্যমূলক প্রক্রিয়া চালু রাখবে?'' প্রশ্নটা তুলেছে সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা তুড়ি মেরে প্রশ্নটাকে উড়িয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের চাহিদা-আকঙ্ক্ষা উপেক্ষা করার অভ্যাস ভারতের শাসনকর্তাদের আছে। এখন সংসদকেও উপেক্ষা করার রেওয়াজ শুরু হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১) 'Land Acquisition and Compensation - What Really Happened in Singur?' Maitreesh Ghatak, Sandip Mitra, Dilip Mookherjee, Anusha Nath, EPW, May 25, 2013.

২) সিঙ্গুরে ৯৯৭.১১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে গোপালনগর, বেরাবেরি, খাসেরভেড়ি, বাজেমেলিয়া, সিংঘেরভেড়ি— এই পাঁচটি মৌজায়। আলোচ্য প্রতিবেদনে উক্ত মৌজাগুলি সহ 'জয়মোল্লা' নামে ছয়টি গ্রামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। জয়মোল্লা পৃথক কোন মৌজা নয়, বেরাবেরি মৌজাভুক্ত একটি গ্রাম।

৩) সিঙ্গুরে টাটা মোটর্স প্রকল্পে মোট অধিগৃহীত জমি ৯৯৭.১১ একর। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে মোট অধিগৃহীত কৃষিজমি ৯৩৬.৭৭ একর। রায়তি কৃষিজমির পরিমাণ ছিল ৮৯৩.৯৫ একর।

৪) *Understanding the Dynamics and Impact of Land Acquisition in Selected Areas of West Bengal* by Action Aid and CUTS International

৫) *Status Report on Land Acquisition in Singur, District Hooghly,* Govt of West Bengal

৬) 'Land Acquisition in a West Bengal District', Abhijit Guha, EPW, 16 October, 2004

৭) Internally Displaced Persons: Challenge to Human Dignity - Walter Fernandes

কারা-চিত্র : ভারত (২০১১)

জেল সংখ্যা: ১৩৮২

বন্দী: পুরুষ ৯৫.৭%, নারী ৪.৩%

মোট বন্দী রাখার সর্বোচ্চ ক্ষমতা: ৩,৩২,৭৮২ জন

৩১.১২.১১ পর্যন্ত বন্দীর সংখ্যা: ৩,৭২,৯২৬

জেল অকুপ্যান্সি রেট: ১১২.১% (২০০৯-১২২.৮%, ২০১০- ১১৫.১%)

জেলে উপচে পড়া বন্দীর ভিড়: জেল অকুপ্যান্সি রেট সর্বাধিক লাক্ষাদ্বীপে (৫০০%)। তার পরে যথাক্রমে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (৩৬২%), ছত্রিশগড় (২৫৬.৩%), দিল্লি (১৯৪%), উত্তরপ্রদেশ (১৭৫.১%), পাঞ্জাব (১৪৯.১%), মধ্যপ্রদেশ (১২৮.২%), ঝাড়খন্ড (১২৮.১%), গোয়া (১২৩.৮%), গুজরাত (১২৩.৫%)। ২০১০ সালের তুলনায় গুজরাত, ঝাড়খন্ড, মেঘালয় ও উত্তরপ্রদেশ জেলে বন্দীর স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা বেড়েছে। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কমেছে।

সাজাপ্রাপ্ত বন্দীর সংখ্যা: ১,২৮,৫৯২ জন। মোট বন্দীর ৩৪.৫%। সর্বাধিক উত্তরপ্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ স্থানে।

রাজনৈতিক বন্দী: কোনও তালিকা সরকারি তথ্যে মেলেনি।

বিভিন্ন রাজ্যে বিচারাধীনকে বন্দী রাখার সময়কাল:

৩ মাস পর্যন্ত: মোট বিচারাধীনের ৪০%। সর্বাধিক অন্ধ্রে।

৬ মাস-১বছর: মোট সংখ্যা ও শতাংশের জাতীয় গড় মেলেনি। সর্বাধিক লাক্ষাদ্বীপে।

১-২ বছর: মোট সংখ্যা এবং শতাংশের জাতীয় গড় মেলেনি। সর্বাধিক গোয়া। তারপর মহারাষ্ট্র ও জম্মু-কাশ্মীর।

২-৩ বছর: মোট বিচারাধীনের ১০ শতাংশের কম। কাশ্মীরে (১৩.৭ শতাংশ) সর্বাধিক।

৩-৫ বছর: ৭৬১৫ জন। সর্বোচ্চ উত্তরপ্রদেশ (২৮৭৯)। বিহার (৮৩০), পশ্চিমবঙ্গ (৪৯৭)।

৫ বছরের বেশি: ১৪৮৬ জন। সর্বাধিক উত্তরপ্রদেশ (৩৪০)। বিহার (২৫২), পশ্চিমবঙ্গ (২০৪)।

বন্দীদের বয়ঃসীমা: দণ্ডিতদের ৪৭ শতাংশের বয়স ৩০-৫০ বছর, ৩৬ শতাংশের ১৮-৩০ বছর। ১৬ শতাংশ পঞ্চাশোর্ধ্ব। ১৮-র নিচে দণ্ডিত কেউ নেই বলে সরকারি হিসেবে দাবি করা হয়েছে।

বিচারাধীনদের ৪৮ শতাংশের বয়স ১৮-৩০ বছর, ৪০.৯ শতাংশের বয়স ৩০-৫০ বছর। ১০.৯ শতাংশের বয়স পঞ্চাশের উপরে। বিচারাধীনদের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে।

অপরাধ ও দণ্ড

১২ জন মহিলা সহ ৪৭৭ জন সাজাপ্রাপ্ত বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে এবছর কোনও ফাঁসি হয়নি। মোট সাজাপ্রাপ্তের ৫৩.৬ শতাংশ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ১১.৭ শতাংশের জেল খাটার মেয়াদ ১০-১৩ বছর। জাতীয় ফৌজদারি আইনে দণ্ডিতদের ৫৮ শতাংশই খুনের আসামী। সর্বাধিক দণ্ডিতদের তালিকায় প্রথমেই উত্তরপ্রদেশ। পরে মধ্যপ্রদেশ। সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশে ধর্ষণের মামলায় দণ্ডিতদের তালিকাতেও সবার উপরে (২৫.৩ শতাংশ)। ধর্ষণে সাজা বেড়েছে।

বন্দীদের শিক্ষাগত মান:

দণ্ডিতদের ২৯.৫% এবং বিচারাধীনদের ৩০.৮% নিরক্ষর। যথাক্রমে ৪৪.৪% এবং ৪২.৬% দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। সব মিলিয়ে ৭৩ শতাংশের বেশি মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোননি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তুলনায় খুবই কম। যেমন ২,৪১,২০০ জন বিচারাধীনের মধ্যে ১০৬৯৮ জন স্নাতক এবং ৩১৫৪ জন স্নাতকোত্তর পড়াশুনা করেছেন।

সামাজিক অবস্থান

দণ্ডিতদের ২৮.৭% এবং বিচারাধীনদের ২৯.৫% ওবিসি গোষ্ঠীভুক্ত। একইভাবে যথাক্রমে ২১.৮% ও ২২.৩% তপশিলি জাতি এবং ১৪.২% ও ১৩.১% তপশিলি জনজাতির মানুষ। ৭০-৭১% ধর্মে হিন্দু এবং ১৭.৮% মুসলমান। উল্লেখযোগ্য, ৫৬.৭% মুসলমান বন্দীই আছেন চারটি রাজ্যের জেলে— উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে।

জেলে মৃত্যু

এক বছরে ১৩৩২ জনের মৃত্যু। এরমধ্যে ৮৮টি অস্বাভাবিক। ৪৩ জন মহিলা বন্দী মারা যান। ৮ জন আত্মঘাতী। ২৮টি জেল ভাঙার ঘটনা ঘটেছে এবং বন্দীদের মধ্যে মারামারির ৩১টি ঘটনা জানা গেছে। এতে ৪ জন বন্দীর মৃত্যু হয়। ৭৭ জন আহত। জেলের ভেতর গুলি চালনায় মৃত্যু: ০.২ শতাংশ। বন্দীদের দ্বারা খুন: ০.৬ শতাংশ।

মহিলা বন্দী: দণ্ডিত ৩৮৩ জন, সঙ্গে ৪৪০টি বাচ্চা। বিচারাধীন ১১৭৭ জন, সঙ্গে ১২৮৯ জন বাচ্চা।

বিদেশি বন্দী: মোট ২০২০ জন দণ্ডিত এবং ৩৬০১ জন বিচারাধীন। সর্বাধিক পশ্চিমবঙ্গেই— দণ্ডিত ৮১৬ এবং বিচারাধীন ১০৪৯ জন (অধিকাংশই বাংলাদেশি)।

মানসিকভাবে অসুস্থ বন্দী: ৪২১৮ জন, মোট বন্দীর ১.১%। সর্বাধিক অন্ধ্রে (৪৭৪)। তারপরই পশ্চিমবঙ্গে (৪৫৫)।

সূত্র: প্রিজন স্ট্যাটিসটিক্স, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো

কারা-কাহিনী

বিনা বিচারে কারাগারে

বিশ্বজিৎ রায়

তুষার মণ্ডল (২২), ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত বৌবাজার এলাকার বাসিন্দা। বিচারাধীন বন্দী হিসাবে ছয় বছর প্রেসিডেন্সি জেলে। ''মামলার শুনানি আজও শুরু হয়নি। ছয় বছর ধরে আমরা জেল আর আদালতে ছুটে মরছি। উকিল মোক্তারের খরচ জোগাতে আমাদের পরিবার প্রায় সর্বস্বান্ত। আমার স্বামী হার্টের রুগি। আমরা আর টানতে পারছি না।'' কাঁদতে কাঁদতে জানালেন তুষারের মা মঙ্গলা দেবী। তুষারের মামলায় সহবন্দী রাহুল রাউত বিচারের নামে প্রহসনের অভিজ্ঞতা শোনালেন। ''কোনও দিন সাক্ষী আসেনি। কোনও দিন তদন্তকারী অফিসার গরহাজির তো কোনওদিন আবার সরকারি উকিল নেই। এরা থাকেন তো জজসাহেব ছুটিতে। এভাবেই বছরের পর বছর গড়িয়ে চলেছে।'' বললেন রাহুলের মা কুন্তি দেবী।

বিহারের নওয়াদার বাসিন্দা বৃদ্ধা ফিরোজা বেগম প্রতিবার কোর্টের ডেট পড়লে কলকাতায় ছুটে আসেন। তঁার ছেলে মহম্মদ সওকত খুনের মামলার আসামী হয়ে সাত বছর প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। ফিরোজা তঁার মেয়েকে নিয়ে ছোটাছুটি করেন ছেলের মুক্তির আসায়। মিথ্যা মামলায় শওকতকে শেখ কালু নামে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তঁার অভিযোগ। বৃদ্ধা আগে কলকাতায় লোকের বাড়ি বাসন মেজে দিন-গুজরান করতেন। এখন আর পারেন না। তঁার স্বামীও শয্যাশায়ী। ''আমাদের জমিজমা নেই। বৃদ্ধ বয়সে ছেলের রোজগারই ছিল ভরসা। তার বিচারের আশায় আমরা না খেয়ে মরছি। এখন আর উকিলের খরচ চালাতে পারি না। জেল থেকে ছেলের আবেদনে জজসাহেব সরকারি উকিলের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেই উকিলও আড়াই হাজার টাকা দাবি করছে। বলছে, নইলে কোর্টে দাঁড়াবে না। সরকার নাকি তাদের অনেক টাকা ফি বাকি রেখেছে। আমরা তাহলে কোথায় যাবো?'' বৃদ্ধার কাতর জিজ্ঞাসা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উস্তির বাসিন্দা ফরিদা বিবি অঝোরে কাঁদছিলেন। তঁার ২৫ বছরের ছেলে শেখ ময়না সেলফোন চুরির দায়ে বেশ কয়েক বছর বন্দী প্রেসিডেন্সিতেই। ''আমাদের ছেলে তিনজলা-তপসিয়ার ব্যাগ তৈরির কারখানায় কাজ করত। বাড়ি ফেরার পথে বালিগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনে যাত্রীদের মোবাইল চুরির ঘটনায় গোলমালে আসল চোর পালায়। আমার ছেলেকে চোর বলে ধরে পুলিশ।'' জানালেন ফরিদা বিবি। তঁার কথায়, ফোন চুরির জন্য এতদিন জেলে পচতে হত না তঁার ছেলেকে। কিন্তু একবার নিজের শিশু সন্তানকে কাঁদতে দেখে সে মাথা ঠিক রাখতে পরেনি। জেল হাসপাতাল থেকে পালায়। ''আমি নিজে ওকে পুলিশের কাছে সারেন্ডার করাই। পুলিশ ভয় দেখিয়েছিল, ধরতে পারলে গুলি করে মেরে দেবে। বলেছিল, সারেন্ডার করলে অল্প সাজা হবে। কিন্তু তারপর ওকে ডাকাতি কেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে। আমি কোর্ট আর জেল ঘুরে যাচ্ছি। বিচার আর হচ্ছে না।'' বললেন ফরিদা। ঈদের দিন ছেলের জন্য নতুন লুঙ্গি আর খাবার নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু জেলে ঢুকতে পারেননি ভোটার পরিচয়পত্র সঙ্গে না আনায়। তাড়াহুড়োয় নাতিকে ফাঁকি দিয়ে বেরোতে গিয়ে সেটি ব্যাগে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। এটা ছাড়া জেল কর্তৃপক্ষ দেখা করতে দেবে না। ''ওরা জানে আমাদের ছেলে বন্দী। কতবার এসেছি। তবু ছাড়বে না। আমাদের জন্য কি বাবা সরকারের কোনও দয়া-মায়া নেই?''

তমাল দত্ত আর এক যুবক। তিন বছর ধরে জেলবন্দী উল্টোডাঙ্গা থানার একটি খুনের মামলায়। ছেলের বিচারের আশায় কয়েক হাজার টাকা ব্যয়ের পর তার বাবা তারক দত্তের অভিজ্ঞতা: ''আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের দ্রুত বিচার বা মুক্তির আশা বাতুলতা। কেননা পুলিশ, উকিল, কোর্টবাবু বা কখনও জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের পিছনে জলের মতো টাকা খরচ করার সামর্থ্য আমাদের নেই।'' ভবানীপুর এলাকার বাসিন্দা মানস দে একটি অপহরণের মামলায় অভিযুক্ত হয়ে পাঁচ বছরের বেশি জেলে। তার স্ত্রী স্নিগ্ধা জানালেন, মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়ানের অনুমতি পাননি মানস। মায়ের শ্রাদ্ধের সময় তিন দিনের জন্য প্যারোলে ছাড়া পান। ''যে বাচ্চাটিকে অপহরণে যুক্ত থাকার অভিযোগে মানস বন্দী সে কদিন পরেই বাড়িতে ফিরে এসেছে তার বাবা মায়ের কাছে। কিন্তু আমার ছোট মেয়ে আজও তার বাবাকে খুঁজছে। আমি তাকে জবাব দিতে পারিনা। জেল আর কোর্ট দৌড়ে আমি আর পারছি না।'' বললেন স্নিগ্ধা।

উপরোক্ত বন্দীরা কেউ কেউ হয়তো ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জেলে জেলে এমন অসংখ্য বন্দী এবং তাঁদের পরিবারগুলির দুর্দশার ইতিবৃত্ত এতটুকু বদলায়নি।

রাজনৈতিক বন্দী

সাধারণ বন্দীদের সঙ্গেই আছেন রাজনৈতিক বন্দীরা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা সহ অন্যান্য ফৌজদারি মামলায় বছরের পর বছর বিচারাধীন এই বন্দীদের সিংহভাগ তথাকথিত মাওবাদী বা সিপিআই(মাওবাদী)-র সদস্য-সমর্থক। এছাড়াও আছেন এসইউসিআই ও অন্যান্য দলের কর্মী

কারা-চিত্র: পশ্চিমবঙ্গ (২০১২)

জেলের সংখ্যা: ৫৭
বন্দী ধারণ ক্ষমতা: ২০২৯৭
বন্দীর সংখ্যা:
১.১.২০১২ - ১৯৫০৮ (পুরুষ ১৮৩৫১, মহিলা ১১৫৭)
৩১.১২.২০১২ - ২০৪৩১ (পুরুষ ১৯১১৬, মহিলা ১৩১৫)
দণ্ডিত: ৬১৭১ জন (পুরুষ ৫৭৬৭, মহিলা ৪০৪)
বিচারাধীন: ১৩৯৭৭ জন (পুরুষ ১৩১০৬, মহিলা ৮৭১)
ডেটেনিউ: ৩ জন (পুরুষ)
অন্যান্য: ২৮০ জন (পুরুষ ২৪০, মহিলা ৪০ জন)
রাজনৈতিক বন্দী: তালিকায় নেই।
মানসিকভাবে অসুস্থ: ৪১৭ জন (পুরুষ ৩৭৮, মহিলা ৩৯)। এদের মধ্যে বিচারাধীন ২৫১ জন (পুরুষ ২২১, মহিলা ৩০)
শিশুসহ মহিলা বন্দী: ১৬৯ (শিশু ২২০)। দণ্ডিত মা ৩০ (শিশু ৪৩), বিচারাধীন মা ১২২ (শিশু ১৫৩)। অন্যান্য মা ১৭ (শিশু ২৪)।
ভারতীয় বন্দীদের বয়ঃসীমা: দণ্ডিতদের মধ্যে ১৮-৩০ বছর বয়স (১৬৫০ পুরুষ, মহিলা ৯৪), ৩০-৫৯ বছর (পুরুষ ২৩৬৩, মহিলা ১১৬), পঞ্চাশোর্ধ (পুরুষ ৭৯৩, মহিলা ১১৫)। দণ্ডিত ও বিচারাধীনদের মধ্যে ১৬-১৮ বছরের কমবয়সী বন্দী নেই বলে দাবি।

দণ্ডিতদের অপরাধের ধরন:

খুনের দায়ে সাজাপ্রাপ্তের সংখ্যা সর্বাধিক— ২৬৫৯ (পুরুষ ২৫৩০)। এরপর ধর্যণের সাজা খাটছেন ৩৩৬ জন (৩৩৪ জন পুরুষ)। শ্লীলতাহানি এবং ইভ টিজিং এর দায়ে সাজার ঘরে শূণ্য। তবে বধূ নির্যাতনের ঘটনায় সাজা খাটছেন ১০১ জন (পুরুষ ৫৯, মহিলা ৪২)। ভারতীয় ফৌজদারি আইনের বাইরে অন্যান্য আইনে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যাটি বিদেশি অনুপ্রবেশকারী সংক্রান্ত, রেজিস্ট্রেশন অব ফরেনার্স অ্যাক্ট-এ। মোট দণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক এরাই— ৯৪৪ (পুরুষ ৮৬৫, মহিলা ৭৯)। এর পর আছেন মাদক বিরোধী আইনে (এনডিপিএস অ্যাক্ট) দণ্ডিতরা— ৩১১ (পুরুষ ২৯৩ মহিলা ১৮)। সন্ত্রাস বিরোধী আইন, অধুনা বাতিল টাডায় বন্দী ৪ জন। তথাকথিত নয়া সন্ত্রাস বিরোধী আইন, প্রিভেনশন অফ আন'লফুল অ্যাক্টিভিটিজ অ্যাক্টে বিগত কয়েক বছর থেকে বেশ কিছু গ্রেপ্তার হয়েছে। এরাজ্যে দণ্ডিতদের তালিকায় এখনও এই আইনে সাজাপ্রাপ্তদের সংখ্যাটি নেই। অস্ত্র আইনে দণ্ডিত ৭৪ (সকলেই পুরুষ)। বিস্ফোরক সংক্রান্ত আইনে সাজা খাটছেন ৫ জন। পণবিরোধী আইনে সাজাপ্রাপ্ত ৬৪ জন (পুরুষ ৬৩)। কিন্তু নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ আইন বা তপশিলি জাতি- উপজাতিদের উপর অত্যাচার বিরোধী আইন ও দুর্নীতি বিরোধী আইনে সাজাপ্রাপ্তদের সংখ্যাটি শূন্য। কৌতূহলের বিষয়, নাগরিক অধিকার রক্ষা আইনে ১৬ জন সাজাপ্রাপ্ত। যে রাজ্যে বা দেশে শাসকেরা প্রতিমুহূর্তে নাগরিক অধিকার লঙঘন করে, সেখানে এই দণ্ডিতরা কারা?

বিচারাধীন বন্দীদের অপরাধের ধরন

এক্ষেত্রেও খুনের আসামীর সংখ্যা সর্বাধিক— ২১২১ (পুরুষ ১৯৪৭, মহিলা ১৭৪)। এর পরের সংখ্যাটি চুরি ৯৮১ (মহিলা ১৮) এবং ডাকাতির— ৯৫৮ (মহিলা ৭)। ডাকাতির উদ্দেশ্যে ধৃত ৬৪০, রাহাজানি ৪৫৫। ধর্যণ ৯১০ (মহিলা ৬) পণ সংক্রান্ত বধূহত্যা ৩৬৩ (৭৮ মহিলা) এবং বধূ নির্যাতন ৯০৬ (মহিলা ১১২)। পণ নিবারণ আইনে ধৃত ১৩৭ (মহিলা ৩) শ্লীলতাহানি এবং ইভটিজিং-এর মামলায় ধৃতের সংখ্যা যথাক্রমে ২৩ এবং ১৪। ফৌজদারি আইনের বাইরের আইনে বন্দীদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যা বিদেশি আইনে বন্দীরা— ১২৭৪ (পুরুষ ১০৯১ মহিলা ১৮৩)। এর পরেই স্থান মাদক আইনে ধৃতরা— ১০৪০ (পুরুষ ৯৮৯ এবং মহিলা ৫১)। অস্ত্র আইনে ধৃত ৩৭২ (পুরুষ ৩৬৪ এবং মহিলা ৮)। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ আইনে ১১। তপশিলি জাতি-উপজাতি সংক্রান্ত আইনে ৭ জন। টাডা আইনে ধৃত ১৭। নয়া সন্ত্রাস বিরোধী আইনে বন্দীদের সংখ্যা তালিকায় পাওয়া যায়নি।

বিচারাধীন বন্দিদের কারাবাসের সময়সীমা ও সংখ্যা (১.১২.১২ পর্যন্ত)

৩-৬ মাস: ৩৬৩৭, ৬-১২ মাস: ২০১৩, ১-৩ বছর: ১৭১১, ৩-৫ বছর: ৭২৫, ৫ বছরের বেশি: ২৬৩।

বন্দীদের শিক্ষাগত মান

দণ্ডিত: মোট ৬১৭১। নিরক্ষর ২১১৮ (পুরুষ ১৯২৫), দশমশ্রেণীর নিচে ৩০৫৫ (পুরুষ ২৯০৫), স্নাতক ১৮৩ (পুরুষ ১৬৪), স্নাতকোত্তর ৩৮ (পুরুষ ৩৫)।

বিচারাধীন: মোট ১৩৯৭৭। নিরক্ষর ৪৫০৫ (পুরুষ ৪১৩৫), দশমশ্রেণীর নিচে ৭৪৮৮ (পুরুষ ৭০৪৫), স্নাতক ৩৮৩ (পুরুষ ৩৭৬), স্নাতকোত্তর ৫৮ (পুরুষ ৫৪)।

ধর্মীয় পরিচিতি

দণ্ডিত: হিন্দু ৩২৭৯, মুসলমান ২৭৪১
বিচারাধীন: হিন্দু ৬৯৮০, মুসলমান ৬৫২০।

জাতিগত অবস্থান

দণ্ডিতদের মধ্যে ১০৩১ জন তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ৬১৬ জন। বিচারাধীনদের মধ্যে ২৪৭৬ জন তপশিলি জাতি, ১৩১৩জন তপশিলি উপজাতিভুক্ত। শতাংশের বিচারে নিম্নবর্ণ তথা বর্গের এই দুই গোষ্ঠীভূক্ত বন্দীর সংখ্যা দুই ক্ষেত্রেই প্রায় ২০ শতাংশ। রাজ্যের সামগ্রিক জনসংখ্যায় এই গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্বের (যথাক্রমে ২৩ শতাংশ ও ৫.৫ শতাংশ) তুলনায় বন্দীদের মধ্যে এদের উপস্থিতির হার অনেক বেশি। এই হার একদা বাম শাসিত, প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গের অপরাধ ও শাস্তির রাষ্ট্রীয় সামাজিক চিত্রে নিম্নবর্গীয় মানুষের অবস্থানটির দিকে ইঙ্গিত করে। বোঝাই যায় উচ্চবর্গীয় ও বর্ণীয় ঔপনিবেশিক কালের ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের ধারাবাহিকতা আজও অম্লান।

বাংলাদেশি বন্দী (১.৬.২০১৩ পর্যন্ত)

দণ্ডিত- ১২০৩, বিচারাধীন- ১৫৮৪, শিশুবন্দী- ১৭১, মুক্তবন্দী- ৩৫৮, দেশে ফেরত- ১০৩

জেলে মৃত্যু: ৮১ (অস্বাভাবিক মৃত্যু ৭। সবই আত্মহত্যা জনিত বলে দাবি)

প্যারোলে মুক্তি: ১৩১১ (মহিলা ৮১)। সবাই জেলে ফিরেছেন। কেউ পালাননি।

সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ কারা দপ্তরের ওয়েবসাইট

সমর্থকেরা। উত্তরবঙ্গের কেএলও (কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন), গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিচারাধীন বন্দীদের একটি বড়ো অংশ জামিনে মুক্তি পেলেও মাওবাদী এবং অল্পসংখ্যক অন্য বিরোধী দলের কর্মীরা আজও জেলবন্দী। এদেরই একজন সিদ্ধার্থ মণ্ডল তিনবছর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রয়েছেন। বিষ্ণুপুর থানার একটি মামলার সূত্রে ২০১০ সালে গ্রেপ্তার হলেও আজও তিনি বিচারের অপেক্ষায়। হতাশা-ক্ষোভে-যন্ত্রণায় তিনি আদালতের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যু তথা মার্সি কিলিং-এর আবেদন জানিয়েছেন। সংবিধানে এই অধিকারের সংস্থান নেই। এই যুক্তিতে আদালত তা নাকচ করলেও সিদ্ধার্থের মৃত্যু-যাতনা বিবেকবান মানুষকে নাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ন্যায় ও আইনের শাসনের ধ্বজাধারীদের তা বিচলিত করতে পারেনি। তার আইনজীবী শুভাশিস রায়ের কথায়, আজও সিদ্ধার্থের মামলার শুনানি শুরু হয়নি। চল্লিশ বছরের সিদ্ধার্থ আদালতে লিখিত চিঠিতে জানিয়েছেন, কীভাবে রাজ্য পুলিশের সিআইডি শাখা তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে পচিয়ে মারার ষড়যন্ত্র করছে। কীভাব তাঁর পরিবার দুঃসহ দিন কাটাচ্ছেন তার দ্রুত বিচার ও মুক্তির আশায়।

প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, গৌর চক্রবর্তী, মধুসূদন মণ্ডলদের ইতিবৃত্ত একইরকম মর্মান্তিক। প্রদীপের দাদা প্রসূনও মাওবাদী অভিযোগে ২০০৯ সাল থেকে মেদিনীপুর জেলে বন্দি। দুই ভাইয়ের মা রীনা চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্বামী মানসিক ও শারীরিকভাবে চরম বিপর্যস্ত। তিনি জানালেন, ছেলেদের মুক্তির আশায় তাঁর স্বামী আজ স্মৃতিলোপ এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত। তিনি নিজেও হার্ট সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগছেন। সেদিনের বিরোধী নেত্রী ও আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন-পূর্ব আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়ে রীনা দেবীর প্রশ্ন: কোথায় গেল তাঁর বন্দীমুক্তির প্রতিশ্রুতি? বামফ্রন্ট আমলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাজাত মিথ্যা মামলায় অভিযুক্তদের প্রতি বন্দীমুক্তি রিভিউ কমিটির মাধ্যমে সুবিচারের ঢক্কানিনাদের পরিণতিই বা কী? তাঁরই মতো আরেক বিধ্বস্ত মা বেলেঘাটার দুর্গা দাস। তাঁর ছেলে প্রশান্ত ২০০৮ সাল থেকে মাওবাদী সন্দেহে বিভিন্ন জেলে বন্দী। "আমার স্বামী বৃদ্ধ, চলৎশক্তিহীন। প্রশান্ত আমাদের একমাত্র ছেলে। সরকার এতই প্রতিহিংসাকাতর যে ওকে এক জেল থেকে আর এক জেলে পাচারের খবর পর্যন্ত জানতে পারি না। কতদিন তো এমন হয়েছে জেলগেটে সারাদিন অপেক্ষা করে ফেরত গেছি। দেখা করতে দেয়নি। আর কতকাল এভাবে ছেলেদের সঙ্গে বাবা মাকেও শাস্তি দেবে ওরা?" বৃদ্ধার প্রশ্ন। গৌর চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয় একটি টেলিভিশন স্টুডিও থেকে ২০০৯ সালে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা সহ অন্যান্য অভিযোগে কয়েকটি মামলা ঝুলছে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতায় অসুস্থ মানুষটি জানেন না কবে তিনি সাজা বা মুক্তি পাবেন। নিউরোলজিক্যাল সমস্যার কারণে তাঁর দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা দরকার। জেলে বা পুলিশি হেফাজতে থাকলে বাইরের হাসপাতালে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা হয় মাত্র। ইতিমধ্যে তাঁর ছেলেকেও গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ একই ধরনের অভিযোগে। স্বামীর দ্রুত বিচার ও মুক্তির আশায় তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যদের হয়রানি, দৌড়ঝাঁপ চলছেই। গৌরবাবুর সহবন্দী মধুসূদন মণ্ডলও কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন। মাওবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়ার পর দুবছরের বেশি কেটে গেছে। বিচারের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে তাঁর অসুস্থতা গুরুতর হয়ে উঠেছে।

লালগড় আন্দোলন তথা জঙ্গলমহলে পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো ২০০৯ সাল থেকে বন্দী। বেশ কয়েকটি মামলায় জামিন পেলেও ছত্রধরকে আজও মুক্তি দেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ২০০৮-১০ পর্বে জঙ্গলমহল আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং কমিটির নেতা-নেতৃদের সঙ্গে প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতা পশ্চিম মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় রাজনৈতিক জমি পেতে সাহায্য করে সেদিনের বিরোধী নেত্রীকে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর বন্দীমুক্তি প্রশ্নে তাঁর প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদে এবারের পঞ্চায়েত ভোটে ছত্রধরের পরিবার বুথমুখো হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি বিশ্বাসঘাতক বলেছেন ছত্রধরের স্ত্রী ও মা। "আগের সরকারের আমলে আমার এক ছেলে (শশধর মাহাতো)-কে মেরেছে যৌথ বাহিনী। আর এক ছেলেকে আটকে রেখেছে মমতা। পরিবর্তনে তো আমার ছেলেরাও সাহায্য করেছে। আমরা কী পেলাম?" মা বেদনার প্রশ্ন।

অবিরত চেনামুখ

জেলখানার বাইরের ভিড়ে এরকম কত না মুখ। বাইরে শহর ছুটে চলেছে আপন ছন্দে, নাগরিক জীবন নিজস্ব বারোমাস্যায় মশগুল। কিন্তু দেশ তথা রাজ্যের যে কোন জেলগেটে যে কোনওদিন কিছুক্ষণ দাঁড়ালে বিচারাধীন বন্দিদের পরিবার পরিজনদের অন্তহীন হয়রানি, বছরের পর বছর দুর্বিষহ প্রতীক্ষার যন্ত্রণা আর আশাভঙ্গের কান্না-ক্ষোভজর্জর কাহিনী বাতাস ভারাক্রান্ত করে তোলে। যারা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, তাদের অবস্থা আরও মর্মান্তিক। বিচারের বাণী এখানে নিভৃতে কাঁদে, নিষ্ফল ক্রোধে বেদনায় অন্ধ দেওয়ালে মাথা কোটে। বন্দীদের কথা, তাঁদের মানবাধিকার তথা সাংবিধানিক ও আইনি অধিকারের দৈনন্দিন উল্লঙ্ঘনের কাহিনী সাধারণ মানুষ খুব কমই জানতে পারেন। পুলিশ ও কারা দফতরের কর্তারা মুক্তধারা-র মতো সিনেমা বা বন্দীদের আঁকা ছবির প্রমোশনে অংশীদার হয়ে 'কয়েদি' বা আসামি'দের সাংস্কৃতিক বিকাশে সরকারি উদ্যোগের দামামা বাজান, আমলা-মন্ত্রীদের মানবিক

১৯৭৯ সালে ৭৮তম আইন কমিশনের রিপোর্ট

বিচারাধীন বন্দীর উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমিশন তিন ধরনের বন্দীর কথা বলেছেন: ক) জামিন-অযোগ্য ধারায় বন্দী যিনি আদালত থেকে জামিন পাননি; খ) কোর্ট জামিন দিলেও যথাযথ জামিনদার না মেলায় ও অন্যান্য কারণে 'বেল বন্ড' দাখিল করতে পারেননি; গ) জামিনযোগ্য ধারায় বিচারাধীন হলেও একই কারণে জামিন নিতে পারেননি। ৭৭তম রিপোর্টেও এদের সম্পর্কে ট্রায়াল কোর্টগুলির দীর্ঘসূত্রতাকে দায়ী করে আশু ও দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারমূলক পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছিল। একথা স্মরণ করিয়ে পরবর্তী কমিটি ফের ওই পদক্ষেপগুলি গ্রহণে আশু উদ্যোগের কথা বলেছেন।

দ্বিতীয়ত কমিশন বর্তমানে জামিন সংক্রান্ত ধারণা, বিদ্যমান আইন এবং ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ সময়সীমা সংক্রান্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে পুনর্বিচার করে সব দিক খতিয়ে নতুন আইনের পরামর্শ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, সে দেশে সব অপরাধেই জামিন পাওয়ার অধিকারের পক্ষে একটি ধারণা চালু। কোর্ট সিওরিটি ছাড়াই জামিন দিতে পারে। জামিনে মুক্ত ব্যক্তি কোর্টের নির্দেশ মতো আত্মসমর্পণ না করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হয়। জামিন হচ্ছে শর্তসাপেক্ষে। তৃতীয়ত মামলার পাহাড় কমানোর জন্য বিচারবিভাগকে জেলবন্দীদের মামলাগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এবং আগের কমিটির সুপারিশমতো ছয়মাসের বদলে চার মাসে মামলার নিষ্পত্তির সময়সীমা ধার্য করতে হবে।

চতুর্থত, বাদী-বিবাদীদের পক্ষে মামলা দীর্ঘায়ত করার চেষ্টা আটকাতে বিচারবিভাগকে কঠোর হতে হবে। দায়রা আদালতের বিচারকদের বিচারাধীন বন্দীদের মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে হবে, বিশেষ করে যেগুলি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয় নি।

পঞ্চমত, রাজনৈতিক ও অন্যান্য আন্দোলনের পর্বে আইন অমান্য করে বহু লোক জেলে যান। তাঁরা অনেক সময় জামিন পান না। তাঁদের গ্রেফতারের পরই আদালতে তুললে জেলে ভিড় কমবে।

ষষ্ঠত, একটি বিরাট সংখ্যক জেলবন্দীকে সামাজিক শান্তি ও 'গুড বিহেভিয়ার' নিশ্চিত করতে ধরে রাখা হয়। প্রধান কারণ, এদের অধিকাংশ জামিনদার জোগাড় করতে পারেন নি বা 'জেল বন্ড'-এর টাকা মেটাতে পারেননি। এদের মামলা দ্রুত শুনে মীমাংসা করতে হবে। চেষ্টা থাকা উচিত যাতে তিন মাসে নিষ্পত্তি করা যায়।

সপ্তমত, তদন্তের নামে অনন্তকাল পুলিশি টালবাহানা বন্ধ করায় ব্যবস্থা নিতে হবে। তদন্তকারী অফিসারদের 'ল অ্যান্ড অর্ডার' ডিউটিতে পাঠানো বন্ধ করা উচিত। এতে যে তদন্ত ব্যাহত হয় তা আগের কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে তদন্ত শেষ না হলে অভিযুক্তকে জামিনে ছাড়া উচিত। এতে দ্রুত তদন্তের জন্য চাপ বাড়বে।

অষ্টমত, যে সব মামলায় অভিযুক্ত জেলবন্দী, সে সব ক্ষেত্রে মামলার শুনানি মুলতুবি করা উচিত নয়, যদি তা বিশেষ কারণে জরুরি না হয়।

কমিশন বিশেষ করে জামিনযোগ্য অপরাধের পরিধি বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন। সেই অনুযায়ী ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি (আইপিসি) এবং ফৌজদারি কার্যবিধি (সিআরপিসি) সংশোধন করার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া আইপিসি ভিন্ন অপরাপর আইনে যে সব অপরাধে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে কমিশন জামিনের সুপারিশ করেছেন। (ছাড় দিয়েছেন অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট ১৯২৩-কে)। এ জন্য সিআরপিসি সংশোধনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে:

ক) জামিনের জন্য প্রদেয় অঙ্ক যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়; খ) জামিনযোগ্য মামলায় একমাস জেলে থাকার পরও বন্দী জামিনদার যোগাড় না করতে পারলে আদালত তাকে সিওরিটি ছাড়াই জামিন দিতে পারবে; গ) জামিন-অযোগ্য ধারার মামলার ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার এবং আদালতের বিশেষ অধিকার থাকা উচিত 'সিওরিটি' ছাড়াই জামিন দেওয়ার ব্যাপারে। সেই মর্মে সিআরপিসি সংশোধন করতে হবে; ঘ) সিআরপিসি- তে একটি নতুন ধারা যুক্ত করা উচিত যাতে জামিনে মুক্ত অভিযুক্ত নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে হাজিরা এবং নির্দেশমতো হেফাজতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যা অমান্য করলে দুবছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানা দুই-ই হবে। এই নতুন অপরাধটি 'কগনিজিবল', জামিন-অযোগ্য হবে এবং যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচার করবেন।

এছাড়া জেলে বিচারাধীন ও দণ্ডিতদের একসঙ্গে রাখার বিরোধিতা করে কমিটি দুই ধরনের বন্দীদের আলাদা বন্দীশালা করার কথা বলেছেন। যারা জামিন পেয়েও টাকার অভাবে এবং অন্যান্য কারণে জামিন নিতে পারেন না তাঁদের জন্য 'বেইল হস্টেল' নির্মাণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, বিচারপতি খান্নার নেতৃত্বে এই কমিশনের বক্তব্য: জেলে বন্দীদের আটকে রাখার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে বহুবিধ উদ্যোগ প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় তার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

Unfiled Notes Page 30

মুখের বিজ্ঞাপন সাজান। বিভীষিকার জেলকে কেতাবি সংশোধনাগারের তকমা দিয়ে এহেন ভাবের ঘরে চুরির চূড়ান্ত ভণ্ডামি ধরা পড়ে যায় যখন ভরা আদালতে কোর্ট লক-আপে বিচারাধীন কোন বন্দী ব্লেডের আঘাতে নিজেকে রক্তাক্ত করে বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালায়। বছরের পর বছর বিচারের নামে প্রহসনের নারকীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তি-বন্দীর এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কখনও জেলের ভিতরে সমবেত রক্তাক্ত বিদ্রোহ, কখনও ভুখ-হরতালের রূপ নেয়। সরকার পক্ষের ঔদাসীন্য, সেন্সর নীতির আড়াল পেরিয়ে সে খবর মিডিয়ায় খুব কমই প্রচারিত হয়। শুধু পুলিশ বা কারাদপ্তর নয়, ন্যায় ও আইনের শাসনের ধ্বজাধারী বিচারব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অমানবিকতা, আমলাতান্ত্রিক ঔদাসীন্য আর দীর্ঘসূত্রিতার বিরুদ্ধে বন্দীর বেদনা-ক্রোধ ফেটে পড়ে আদালতেও। কেউ চটি ছুড়ে মারে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটকে। কেউ তিলে তিলে পচে মরার তুলনায় স্বেচ্ছামৃত্যু শ্রেয় জ্ঞানে আদালতের কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করেন। সরকারি বিষপানে আত্মহনন হোক বা সরকারি ডাক্তারের 'মাসি কিলিং, এই মৃত্যুযাতনা আমাদের ঔপনিবেশিক 'ক্রিমিন্যাল জাস্টিস সিস্টেম' তথা ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার ভয়াবহ অমানবিক, অগণতান্ত্রিক চরিত্র তথা বিত্তবান ও ক্ষমতাধরদের প্রতি পক্ষপাতের নগ্ন চেহারাই উন্মোচিত করে। জেলের বাইরে সংসদীয় গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দির রূপে পূজিত সংসদ ও বিধানসভা এবং উচ্চ বিচারালয়ের সুউচ্চ সৌধগুলির অন্দরে-অলিন্দে মাঝেমধ্যে আইন-প্রণেতা এবং ন্যায়মূর্তিদের কণ্ঠে দেশের কারাগারগুলির সংখ্যাগুরু বাসিন্দা বিচারাধীন ও দণ্ডিত বন্দীদের মানবাধিকার হনন, বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে নানা উদ্বেগ শোনা যায়। মিডিয়ায় তা সামান্য প্রচারিত হয়। তারপর বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায় রাষ্ট্র ও সমাজের অভিভাবকদের উদ্বেগ ও বিবেকপীড়নের শব্দ। কারান্তরালের মানুষগুলো এবং তাঁদের পরিজনরা সরকার, বিচারবিভাগ, মিডিয়া ও নাগরিক সমাজের নজর কাড়তে চেয়ে আন্দোলনে নামেন। সে অন্তরালের আন্দোলন সরকারি দমনপীড়ন, প্রলোভন, ঔদাসীন্য এবং বিভাজননীতির শিকার হয়। আলোকিত নাগরিক সমাজের বৃহত্তর অংশ এবং কর্পোরেট মিডিয়া সাধারণ এবং রাজনৈতিক বন্দী নির্বিশেষে এই আন্দোলনকে গুরুত্ব দেয় না। ভাবখানা হচ্ছে, এরা সব অন্ধকারের প্রতিনিধি, সমাজ ও রাষ্ট্র-শৃঙ্খলার শত্রু অপরাধীর দল। আইন মোতাবেক দণ্ডিত হওয়ার আগেই এঁদের শরীরে দেগে দেওয়া হয় গণশত্রুর তকমা।

দেশ ও রাজ্যে রাজনৈতিক মহল এবং মিডিয়ায় এখন চলেছে ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি— মোদী বনাম রাহুল না মুলায়ম? মায়া-জয়া-মমতা-নবীনের জোট না সিপিএমের তৃতীয় ফ্রন্ট? রয়েছে দেশি-বিদেশি পুঁজিবান্ধব দ্বিতীয় প্রজন্মর অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে তরজা, বিকাশ ও উন্নয়নের নামে কৃষকের জমি দখলের ভালোমন্দ নিয়ে কাজিয়া। পশ্চিমবঙ্গে চলেছে পরিবর্তনের হালহকিকৎ নিয়ে তর্কবিতর্ক। এ সময় দ্রুত বিচার এবং বন্দীমুক্তি নিয়ে ভাবনার সময় কারোর নেই। এ শুধুই বন্দীদের পরিবার-বন্ধু এবং কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার সংগঠনের দায়।

তবু প্রতিবাদ-আন্দোলন থেমে থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, দমদম সহ বিভিন্ন জেলে বিচারাধীন সাধারণ ও রাজনৈতিক বন্দীরা গত কয়েক বছরে দফায় দফায় অনশন, ভুখ-হরতাল চালিয়ে এসেছেন। গত বছর জুলাই-আগস্টে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কিছু বন্দী এবং প্রেসিডেন্সি জেলে তিনশোর বেশি বন্দী দফায় দফায় খাদ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের সমর্থনে জেলগেটে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন পরিজনসহ সহমর্মী মানুষজন। গণতান্ত্রিক অধিকার সমিতি এবং বন্দীমুক্তি কমিটি সহ নাগরিক সমাজের বিভিন্ন শক্তি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সাধারণ বন্দীদের পরিবারগুলিও নিজেদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রেসিডেন্সি জেলগেটে মিলিত প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন ২০১২-র স্বাধীনতা দিবসের সকালেও। বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন তাঁদের পরিবারের লোকজন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির কর্মীরা। তমাল দত্ত, রাহুল রাউতের মতো সাধারণ বন্দী এবং প্রদীপ চ্যাটার্জী, গৌর চক্রবর্তী, মধুসূদন মণ্ডলের মতো রাজনৈতিক বন্দীরা সকলেই অনশন-আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। দাবি তাঁদের দ্বিবিধ— দ্রুত বিচার চাই, বিচার বিলম্বিত হলে জামিনে মুক্তি চাই। রাজনৈতিক বন্দীদের কথায়, এই ভুখ-হরতালের বৈশিষ্ট্য এটাই যে এই প্রতিবাদের নেতৃত্বে সাধারণ বন্দীরাই। তাঁরাই অনশন চালিয়ে গিয়েছেন সরকারের ঔদাসীন্য ও দমন সত্ত্বেও। প্রায় এক মাস ব্যাপী এই আন্দোলনের সময় আমরা পরিবর্তিত পশ্চিমবঙ্গের সরকার, কারামন্ত্রী-আইনমন্ত্রী এবং বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিদের যে মনোভাব দেখেছি তা আগের বামফ্রন্ট জমানার থেকে আলাদা নয়। (রাজনৈতিক বন্দীদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরবর্তী সংখ্যা করব')

রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, হাইকোর্ট ও রাজ্য সরকার

বাম আমলের মতোই পরিবর্তন-পরবর্তী জমানাতেও কারা-কর্তা এবং মন্ত্রী-সান্ত্রীদের প্রচারে বন্দীদের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা সর্বদা ধামাচাপা দেওয়া হয়। এ নিয়ে তথ্য গোপনের প্রয়াস লাগাতার। সরকার ও আমলাতন্ত্র সারা দেশেই এটা করে থাকে। কিন্তু আরও দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে বিচারবিভাগীয় নজরদারির অভাব। সুপ্রিম কোর্ট ও বিভিন্ন হাইকোর্ট নানা নির্দেশে জেলগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন এবং বন্দীদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি এবং তাঁদের আদালতে হাজির করায় জেল ও

ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার সংস্কারকল্পে ২০০৩ সালে গঠিত মলিমাথ কমিটির উল্লেখযোগ্য কিছু সুপারিশ:

অভিযুক্তের অধিকার:
সংবিধান এবং সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত বন্দী বা অভিযুক্তের আইনি অধিকারগুলির নির্যাস একত্রিত করে তা সব রাজ্যে বন্দী বা অভিযুক্তদের ভাষায় অনুবাদ ও প্রচার করতে হবে। শুধু তাই নয়, ফৌজদারি কার্যবিধিতে এটি যুক্ত করতে হবে। ওই কার্যবিধিকে সংশোধন করে বন্দী, অভিযুক্তদের প্রতি পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে আইনি শাস্তির সংস্থান রাখতে হবে। হাতকড়া পরানো এবং সমগোত্রীয় পুলিশি কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। গ্রেফতার জরুরি নয় বা আদালতের নির্দেশ ছাড়া ধরপাকড় করা যাবে না এমন অপরাধের তালিকা বাড়াতে হবে। জামিনযোগ্য বিচারের ক্ষেত্রে অপরাধের তালিকাও সম্প্রসারিত করতে হবে। 'সামারি ট্রায়াল'-যোগ্য মামলা বাড়াতে হবে।

অপরাধের যাঁরা শিকার, তাঁদের অধিকার:
বর্তমান ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিচারের সময় অপরাধের ফলে মৃত, আহত, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা খুবই কম। কমিটির সুপারিশ, সাত বছরের কারাবাসের বিধান আছে এমন অপরাধ সম্পর্কিত মামলায় 'ভিকটিম' বা তিনি মৃত হলে তাঁর আইনি প্রতিনিধিকে ফৌজদারি মামলায় পার্টি করতে হবে। জীবিত থাকলে তিনি বা তাঁর প্রতিনিধিকে পুলিশি তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখতে হবে। তাঁরা আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির, সাক্ষীদের জেরা ও শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন। অভিযুক্তদের জামিন দেওয়া বা তা বাতিল করার বিষয়ে তাঁদের মত শোনা হবে। তদন্তকারী পুলিশ বা আদালত অভিযুক্তকে ছেড়ে দিলে বা লঘু দণ্ড দিলে তার বিরুদ্ধে তাঁরা আপিল করতে পারবেন। অপরাধী ধরা পড়ুক না পড়ুক, গুরুতর অপরাধের শিকারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। সেই অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে হবে। সেই আইনবলে ক্ষতিপূরণ তহবিল গড়ে তুলতে হবে। হিংসাত্মক অপরাধের শিকারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস হতে পারে সংগঠিত অর্থনৈতিক অপরাধচক্রের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি বা প্রতারকদের থেকে আদায় করা অর্থ।

দ্রুত পুলিশি তদন্ত ব্যবস্থা:
আইনের শাসন বলবৎ করার নির্দিষ্ট দায়িত্বসম্পন্ন একটি পৃথক তদন্তব্যবস্থা যা অন্যান্য দৈনন্দিন পুলিশি কার্যকলাপ থেকে পৃথক হবে। জাতীয় ও রাজ্য নিরাপত্তা কমিশন গড়তে হবে যা জাতীয় পুলিশ কমিশন ইতিমধ্যেই সুপারিশ করেছে। রাজ্য স্তরে একজন আইজি এবং জেলাস্তরে একজন অতিরিক্ত এসপি পুলিশি তদন্তগুলির নজরদারি করবেন। সেশন মামলার দেখভাল করবেন উর্ধ্বতন অফিসাররা। ফরেনসিক এবং অন্যান্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে তদন্তে প্রয়োজনীয় গতি ও সাফল্যের প্রয়োজনে। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদন্তকারীর নিযুক্তি এবং প্রশিক্ষণও চাই।

আইন সংশোধন:
শতাধিক বছরের পুরনো আইন ও নিয়মকানুন বদলে সেগুলিকে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। তার জন্য কমিটি ফৌজদারি দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং এভিডেন্স অ্যাক্ট বা সাক্ষ্যপ্রমাণাদি সংক্রান্ত আইনকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা এবং নতুন করে প্রণয়নের সুপারিশ করেছে। বিশেষ করে নজর দেওয়া দরকার গ্রেফতার, জামিন এবং শাস্তি সংক্রান্ত বিধানগুলির ক্ষেত্রে। মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার কড়া শাস্তি বিধানে আইপিসি-র ১৮২/২১১ ধারাগুলি সংশোধন করতে হবে। একই সঙ্গে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন বদলে জাতীয় পুলিশ কমিশনের খসড়া মোতাবেক নতুন পুলিশ আইনের কথা বলা হয়েছে। পুলিশ অভিযোগ নথিবদ্ধ করতে অস্বীকার করলে তাদের শাস্তির ব্যবস্থার পাশাপাশি 'কগনিজজিব্‌ল' এবং 'নন-কগনিজিবল' অপরাধের ভেদ ঘুচিয়ে সব ধরনের অপরাধের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত বাধ্যতামূলক করার সুপারিশও করা হয়েছে।

বিচার বিভাগীয় সংস্কার:
বিচার ব্যবস্থার সমস্ত স্তরে নিযুক্ত বিচারপতিদের মানের ক্রমাবনতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে কমিটি একটি জাতীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেয় যা সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। শুধু তাই নয়, ওই দুই স্তরে বিচারপতিদের সম্পর্কে অভিযোগ উঠলে তা কমিশন খতিয়ে দেখবে। একজন ভালো বিচারকের যোগ্যতার মান ও অন্যান্য গুণাবলী এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট মাপকাঠি হাজির করা উচিত এবং বিচারপতি নিযুক্তিতে তা যথাযথভাবে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তা দেখা উচিত। সংবিধানের ২৩৫ ধারা বলে হাইকোর্ট অধস্তন আদালতগুলির ওপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। কিন্তু বিচারপতিদের সম্পর্কে ওঠা অভিযোগগুলি

সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো এক্তিয়ার নেই হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির। ওই দুই স্তরে বিচারপতিদের 'ইমপিচমেন্ট' প্রক্রিয়া জটিল। কমিটি মনে করে, দেশের প্রধান বিচারপতিদের কিছু ক্ষমতা থাকা উচিত যাতে তিনি সহকর্মী বিচারপতিদের সম্পর্কে কিছু শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন। অন্যান্য স্তরেও ফৌজদারি বিচার সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিচারকদের নিযুক্তির সময়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে পৃথক ফৌজদারি ডিভিশন এবং তার অধীনে বিশেষ বেঞ্চ-এর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ফৌজদারি আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিচারপতিরা তাদের পুরো কার্যকাল এই বিষয়ে বিচারের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

দ্রুত বিচারের প্রয়োজনে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অধস্তনদের নির্দেশ দেবেন, যাতে প্রতিটি মামলার শুনানি শেষ হওয়ার সময়কাল থেকে মামলার রায় ঘোষণার সময়কাল পর্যন্ত প্রতিটি পর্বের সুনির্দিষ্ট তথ্য নথিবদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে ট্রায়াল কোর্টে যে বিপুল কালক্ষেপ ঘটে তা বন্ধে তিন বছরের সাজার বিধান আছে এমন সব অপরাধের 'সামারি ট্রায়াল'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। 'পেটি অফেন্স' বলে পরিচিত অপরাধগুলির ক্ষেত্রে দ্রুত বিচারের জন্য এইসব অপরাধের বিদ্যমান সংজ্ঞা বদলাতে হবে। এসব ক্ষেত্রে এহেন অপরাধের জরিমানার উর্ধ্বসীমা ১০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা করা উচিত যাতে আরও অন্যান্য অপরাধ এর আওতায় চলে আসে। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের লম্বা 'ভেকেশন' বা ছুটির পর্ব বৃহত্তর জনস্বার্থে কমিয়ে আনার কথাও বলেছে কমিটি।

সাক্ষীদের নিরাপত্তা এবং মিথ্যা সাক্ষ্যের শাস্তি:

কমিটির মন্তব্য, বর্তমান বিচারব্যবস্থায় সাক্ষীদের অত্যন্ত হেলাফেলা করা হয়। অপরাধীদের হুমকির ফলে তাঁদের অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেন। তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও নেই। আদালতে দীর্ঘসময় অপেক্ষা এবং বারংবার যাতায়াতের জন্য কোনো রাহাখরচ মেলে না। বারংবার অযৌক্তিক কারণে শুনানি মুলতুবি হলেও তাঁদের ভোগান্তি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোনও হেলদোল নেই, যদিও সাক্ষীদের ওপরই মামলার ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতির বদলে আমেরিকান ধাঁচে সাক্ষীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা, রাহাখরচ দিতে এবং বারংবার হাজিরা ভোগান্তি বন্ধে একগুচ্ছ পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি মিথ্যা সাক্ষ্য বন্ধে তিন মাস কারাবাস এবং ৫০০ টাকা জরিমানার বদলে বিধান বদলে দুই বছর কারাবাস এবং ১০০০০ টাকা জরিমানার কথা বলেছে কমিটি।

বকেয়া মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি:

দুবছরের বেশি বকেয়া মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি 'এরিয়ার ইরাডিকেশন স্কিম' তৈরি করে তার আওতায় বিশেষ আদালতগুচ্ছ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে কমিটি। হাইকোর্টেরই অধীন একটি বিশেষ 'সেল' গড়ার কথা বলা হয়েছে। এই 'সেল' অধস্তন সব আদালত থেকে দুবছরের পুরনো বকেয়া মামলা সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করে 'পেটি অফেন্স' মামলা বা 'সামারি ট্রায়াল'-এর যোগ্য মামলার ব্যবস্থা করবে। লোক-আদালতে মীমাংসাযোগ্য মামলা সেখানে পাঠাবে। বকেয়া মামলার নিষ্পত্তিতে দৈনিক শুনানি, অহেতুক মুলতুবি বন্ধে জোর দেওয়া হয়েছে।

অপরাধ ও দণ্ডের পুনর্বর্গীকরণ:

মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সুপারিশ করে সেক্ষেত্রে সাজার সময়সীমা কমানো ও মকুবের সরকারি ক্ষমতা রদের প্রস্তাব দিয়েছে কমিটি। বৃহত্তর সমাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে না এমন সব মামলা বিচারপর্ব (ট্রায়াল) ছাড়াই নিষ্পত্তি করার পক্ষে সওয়াল করেছে আইন কমিশন। নতুন ধরনের অপরাধের মোকাবিলায় নতুন ধরনের সাজার পক্ষে কমিটি সরকারি তথা জনজীবনের নানা প্রতিষ্ঠানে পদাধিকার কেড়ে নেওয়া, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, বাধ্যতামূলক কমিউনিটি সার্ভিস এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কথা বলেছে।

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং মহিলা অপরাধী:

গর্ভবতী মহিলা বা ছোট সন্তান সহ মায়েদের জেলে বন্দী রাখার বিদ্যমান ব্যবস্থাকে 'নৃশংস' এবং অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেছে কমিটি। কেননা এতে মায়ের সঙ্গে শিশুটিকেও বিনা অপরাধে বন্দী করা হয়, যা তার ভবিষ্যতকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে। এই ব্যবস্থা রোধে কমিটি গর্ভবতী মহিলা এবং সাত বছরের ছোট শিশুর মাকে সাজা হিসেবে জেলে পাঠানোর পরিবর্তে গৃহবন্দী রাখার প্রস্তাব দিয়েছে।

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আইপিসি-র ৪৯৮(ক) ধারার বহুল অপপ্রয়োগের উল্লেখ করে এই ধারাটিকে জামিনযোগ্য ও 'কম্পাউন্ডেবল' করার প্রস্তাব দিয়েছে কমিটি। ধর্ষণের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতায় কমিটির বক্তব্য: এতে ধর্ষকরা তাদের শিকারদের খুন করবে। এক্ষেত্রে কোনো সাজা মকুব ছাড়াই যাবজ্জীবন কারাবাসের সুপারিশ রয়েছে। ধর্ষণ মামলার দ্রুত বিচার এবং 'হাই ডিগ্রি অব সেন্সিটিভিটি' বা সর্বোচ্চ সংবেদনশীলতার ওপর জোর রয়েছে। এজন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যাতে অধস্তন বিচারকরা ধর্ষিতার মানসিক পরিস্থিতি, সামাজিক মর্যাদা ও সম্মানের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং সেইমতো আদালতে বাকিদের নির্দেশ দিতে পারেন।

পুলিশ কর্তৃপক্ষের তৎপরতা খতিয়ে দেখার জন্য জেলা জজ থেকে হাইকোর্টের বিচারপতি স্তরে উদ্যোগ নিতে বলেছেন। এ সংক্রান্ত নানাবিধ নজরদারি কমিটিও রয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কতটুকু হয় হয় তা ওয়াকিবহাল মাত্রেই জানেন।

গতবছর প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দীদের দ্রুত বিচার ও জামিনের দাবিতে সাধারণ ও রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন-বিক্ষোভ চলাকালীন বন্দীমুক্তি কমিটি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলি জেল কর্তৃপক্ষের থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। বন্দীদের পরিবার ও মানবাধিকার সংগঠনগুলির হিসেব অনুযায়ী প্রায় শতিনেক বন্দী মাসাধিককাল বিভিন্ন পর্যায়ে অনশন চালালেও জেল কর্তৃপক্ষ লাগাতার অনশনকারীর সংখ্যা জনা তিরিশের বেশি দেখায়নি। এভাবে আন্দোলনটিকে লঘু করে দেখানোর সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বন্দীদের সঙ্গে মানবাধিকার কর্মীদের দেখাসাক্ষাতে নানারকম বাধা সৃষ্টি চলে। স্বাধীনতা দিবসে স্বয়ং বিচারপতি গাঙ্গুলি জেলে যান এবং কিছু বিদেশি বন্দীর সঙ্গে কথা বলেন। এরাও অনশনে যোগ দিয়েছিলেন। অপরাপর অনশনকারী বন্দী পরিবারগুলির অভিযোগ, তাঁদের প্রিয়জনদের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি।

এর আগে বিচারপতি গাঙ্গুলি প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের রিপোর্টটি কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে পাঠিয়ে অনুরোধ জানান তা যেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতির নজরে আনা হয়। একই সঙ্গে ৬ আগস্টের একটি প্রস্তাবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ জানান যাতে বিচারাধীন বন্দীদের মামলাগুলির দ্রুত শুনানি ও নিষ্পত্তির জন্য তিনি যথোপযুক্ত নির্দেশ দেন। ''বন্দীদের সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করা এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে কমিশনের এই সুপারিশ''— এ কথা প্রস্তাবে লেখা হয়।

কিন্তু একবছর কেটে গেলেও এ ব্যাপারে হাইকোর্টের তরফ থেকে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এমন খবর মেলেনি। কয়েকমাস আগে এ নিয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি কথা বলতে অস্বীকার করেন। সেই সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোকবাবু জানিয়েছিলেন: মানবাধিকার কমিশন হাইকোর্টকে নির্দেশ দিতে পারে না। তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে মাত্র। কিন্তু তাঁর নিজস্ব মনোভাব তিনি গোপন করেন নি।

> অনশনকারীদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য। বন্দীদেরও মানবাধিকার রয়েছে। ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় দ্রুত বিচারের অধিকার প্রত্যেক বিচারাধীনের প্রাপ্য। আইনি পদ্ধতি-প্রকরণ মানা জরুরি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যান্ত্রিকভাবে তা অনুসরণ করার বদলে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিবেচনা করার মানসিকতা হারিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে বিচারকরাও মুক্ত নন।

একই সঙ্গে তিনি রাজ্য সরকারকে নিম্ন আদালতগুলিতে বিচারকদের শূন্য পদগুলি পূরণে উদ্যোগী হতে বলেন। ''এতে বিচারাধীন বন্দী পোষার বিপুল পরিমাণ খরচ কমবে, সরকার এভাবেও দেখতে পারে।''

সরকারের মন্ত্রীরা মানবাধিকার সংক্রান্ত কোর্ট এবং নিম্ন আদালতে বিচারকের শূন্যস্থান পূরণের উদ্যোগের কথা বললেও ব্লক স্তরে ন্যায় আদালত স্থাপনার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় অসহযোগিতায় আটকে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন। বদলে তারা লঘু অপরাধগুলির ক্ষেত্রে 'প্রি-বার্গেনিং কোর্ট' (যেখানে বিচারাধীন অভিযুক্ত দোষ স্বীকার করে নিলে লঘু শাস্তি হতে পারে) স্থাপনে আগ্রহী। এই আদালত অনেকটাই ১৯৯১ সালে সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি এ এস আনন্দের প্রস্তাবিত জেল-আদালতের ধরনে 'পেটি অফেন্স' বিচারের দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনে গঠিত। পরবর্তী কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকও এতে উৎসাহী হয়। তামিলনাড়ু সহ কয়েকটি রাজ্যে এই আদালত জনপ্রিয় হয়। তবে বিশেষজ্ঞরা এর অন্য দিক সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। দ্রুত মুক্তির আগ্রহে দোষ স্বীকার করে নেওয়ার পর অপরাধ না করেও অপরাধীর তালিকায় নাম উঠে যাওয়ায় এহেন বেশ কিছু প্রাক্তন বন্দী পুলিশি হয়রানির শিকার হয়েছেন। চাকরি ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাতও হয়েছেন।

কিন্তু বিচারাধীনদের অধিকাংশই যেখানে খুনজখম, ডাকাতি-রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগে ধৃত (কারাচিত্র: ভারত/কারাচিত্র: পশ্চিমবঙ্গ, পৃ. ২৬ ও ২৮) সেখানে মূল ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার পরতে পরতে দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিকতা এবং চরম অমানবিকতা থেকে মুক্তি কীভাবে সম্ভব? বিগত কয়েক দশকে একের পর এক কেন্দ্রীয় সরকারি কমিশন ও কমিটি ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার মৌলিক সংস্কারে গুচ্ছ গুচ্ছ সুপারিশ করেছেন। মূল প্রতিপাদ্য: ঔপনিবেশিক ফৌজদারি দণ্ডবিধি (ইন্ডিয়ান পিনাল কোড), ফৌজদারি কার্যবিধি (ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড), সাক্ষ্য আইন (এভিডেন্স অ্যাক্ট), পুলিশ আইন ইত্যাদি মূল আইনগুলির খোলনলচে বদলাতে হবে। সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে অপরাধ, জামিন ও শাস্তি সম্পর্কে পুনর্বিচার করতে হবে। লঘু অপরাধগুলির ক্ষেত্রে জামিনযোগ্য অপরাধের তালিকা বাড়াতে হবে। পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহার, তদন্ত এবং বিচারে টালবাহানা বন্ধ করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। পদ্ধতিগতভাবে দায়বদ্ধতার আওতায় আনতে হবে পুলিশ, আইনজীবী, বিচারক সহ সবাইকেই। তদন্ত ও বিচারব্যবস্থার পরিকাঠামোকে যুগোপযোগী করতে হবে। জেলে

এবং আদালতে বন্দীদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। অধিকাংশ সুপারিশকেই ঠান্ডাঘরে পাঠানো হয়েছে। এর কিয়দংশ আমরা এই নিবন্ধে তুলে ধরছি। (দেখুন: আইন কমিশনের সুপারিশ এবং মলিমাথ কমিটির সুপারিশ, পৃ. ৩২) বন্দীদের অধিকার এবং তা রক্ষায় আদালতের ভূমিকা এবং দ্রুত বিচার ও বিচার বিলম্বে জামিন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলীর নমুনাও পেশ করা হলো। (দেখুন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী, পৃ. ৩৬)

কিন্তু সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই মানছেন, ব্যবস্থার উপর দায় চাপিয়ে ব্যক্তিগত বা পেশা-গোষ্ঠীগত দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা বেড়েছে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সর্বস্তরে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দুর্নীতি ও আইনের এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। অপরাধের তদন্তকারী পুলিশ, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ থেকে কোর্টবাবু, সেরেস্তাদার, মুহুরি থেকে আইনজীবী এবং বিচারক— গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছেন প্রতিটি স্তরে অধিকাংশই।

পুলিশের ভূমিকা

থানায় অভিযোগ দায়ের থেকে শুরু করে তদন্ত, ধরপাকড় এবং আদালতে পেশ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে পুলিশ কীভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী ও অর্থবানদের দালালি করে তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু প্রচলিত আইনের অপব্যবহার করে হাজতে- জেলে বিচারাধীন বন্দী তথা অভিযুক্তের সংখ্যাবৃদ্ধিতে পুলিশের অবদান নিয়ে সাধারণ মানুষ ততটা ওয়াকিবহাল নন। আর সেটাই আমাদের জানালেন বাম আমলের দুঁদে পাবলিক প্রসিকিউটার কাজী সফিউল্লাহ। তাঁর কথায়, ঔপনিবেশিক ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ এবং ১৬২ নং ধারাদুটি সাধারণ মানুষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অন্যতম প্রধান অস্ত্র। প্রায়শ পুলিশ একজন অভিযুক্তের বা সাক্ষীর বয়ান সাজিয়ে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নাম মামলায় জড়ায় এবং গ্রেফতার করে। ১৬১ নং ধারা বলে তদন্তকারী অফিসার অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করেন। কিন্তু ১৬২ নং ধারা-বলে বয়ানে সংশ্লিষ্টদের সইসাবুদ করানোর দায় থেকে তিনি মুক্ত। বহু ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিতে ভুয়ো সাক্ষীর নামে বা সাক্ষীকে না জানিয়েই তাঁর বয়ানে ইচ্ছেমতো অন্য লোকের নাম ঢুকিয়ে পুলিশ অভিযুক্তের তালিকা বাড়ায় এবং অবাধে ধরপাকড় চালায়। এরই জেরে জেলে বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা বাড়ে। বিচার পর্বে অনস্তিত্ব সাক্ষীর কথা ধরা পড়লে বা উল্লিখিত সাক্ষী পুলিশি বয়ান অস্বীকার করলেও পুলিশের কোনও সাজা হয় না। কিন্তু ততদিনে অভিযুক্ত বন্দী কয়েক বছর জেলে খাটেন বিনা অপরাধেই। ঔপনিবেশিক সাক্ষ্য আইনে পুলিশ-প্রশাসনের এ হেন কার্যকলাপের শাস্তিবিধান নেই। যে কোনও মামলায় এফআইআর-এ নির্দিষ্ট অভিযুক্তের নামের সঙ্গে নামহীন 'অন্যান্য'দের তালিকাভুক্ত করার সুযোগও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর এবং দুর্নীতির অন্যতম রাস্তা বলে কাজী সাহেবের অভিমত।

প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক এসব নিয়ে একটি বই লিখেছেন- 'ফ্রি ইন্ডিয়ান্স আর প্রিজনারস অফ কলোনিয়াল কজ'। তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য: ব্রিটিশ আমলের ধারাবাহিকতায় আজও পুলিশ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় ১৬১/১৬২ ধারা এবং এফআইআর-এ 'আদার্স' লেখার সুযোগে সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীদের হাজতবাসের ব্যবস্থা করে। বাম আমলেও এ জিনিস ঘটেছে একথা স্বীকার করে তাঁর বক্তব্য: তৃণমূলের জমানায় এটা বেশি করে হচ্ছে। তুল্যমূল্য বিচার এখানে অর্থহীন। কিন্তু তিনি সরকারি ফৌজদারি প্রসিকিউটর পদে দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছেন কীভাবে পুলিশ 'কেস ডায়েরি' যথেচ্ছভাবে 'ম্যানিপুলেট' করে এবং ক্ষমতাসীনদের নির্দেশ মতো ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দোষী সাজায়। সিআরপিসি-র অপব্যবহারকে কেন্দ্র করে বিপুল অভিযোগ থাকায় ২০০৩ সালে কেন্দ্র-নিয়োজিত ভি এস মলিমাথ কমিটি ১৬২ নম্বর ধারায় সংগৃহীত সাক্ষ্যবয়ানে সাক্ষীর স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করলেও আজও তা মানা হয়নি। কেননা সব সরকারই চায় বিরোধীদের ফাঁসানোর ব্রহ্মাস্ত্রগুলি বজায় রাখতে। অথচ ১৬৪ নম্বর ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রদত্ত বয়ানে অভিযুক্ত বা সাক্ষীকে সই করতে হয় বাধ্যতামূলকভাবেই। ''ম্যাজিস্ট্রেটের তুলনায় পুলিশের বিশ্বাসযোগ্যতা কি বেশি?'' প্রশ্ন প্রবীণ সরকারি আইনজীবীর।

একইভাবে সিপিআরপিসি-র ১৬৯ এবং ৩০৯ নম্বর ধারা মোতাবেক বিচারাধীন বন্দী (এবং অভিযোগ থাকলে দণ্ডিতদেরও) নিয়মিত আদালতে হাজির করার দায়িত্ব পুলিশ বহু ক্ষেত্রেই পালন করে না। অনেক সময়ই স্রেফ 'প্রোডাকশন'-এর কাগজপত্র হাজির করে অথবা বিপজ্জনক বা অসুস্থ অভিযুক্তদের নিরাপত্তা বা আদালতে স্থান-সঙ্কুলানের অভাব দেখিয়ে কোর্ট চত্বরে বা কোর্ট-লকআপে ফেলে রাখে। ফলে পুলিশ হেফাজত ও জেলে বন্দীদের উপর শারীরিক অত্যাচার এবং অন্যবিধ নিপীড়ন সম্পর্কে বন্দীরা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ অনেক সময়ই পান না। শুধু পুলিশের বা জেল-কর্তৃপক্ষের এই চরম বে-আইনি, অনৈতিক ও অমানবিক কাজে বহু ক্ষেত্রেই অংশীদার হন নিম্ন আদালতের বিচারক, সরকারি আইনজীবী এবং আদালতের আমলাতন্ত্র। বন্দীকে না দেখেই তাঁরা 'প্রোডাকশন' সংক্রান্ত কাগজপত্রে সইসাবুদ করেন। ''বহু জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-পিপির টিকি পুলিশের হাতে বাঁধা। কেননা তাদের যাতায়াতের গাড়ি এবং অন্যবিধ সুযোগসুবিধা করে দেয় পুলিশই।'' সফিউল্লাহর স্বীকারোক্তি। দণ্ডিত এবং বিচারাধীন বন্দীর কারাবাস দীর্ঘতর করতে পুলিশের হাতে বহুলভাবে অপপ্রয়োগ হয় আর কিছু আইনি

বিচারাধীন এবং দণ্ডিত বন্দীদের
সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য ও নির্দেশাবলী

"কারাবাস মানে বন্দীদের জীবন থেকে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহের বিদায় নয়। বন্দীরা যে কোনো মুক্ত নাগরিকের প্রাপ্য অধিকারই পাবেন, শুধুমাত্র বন্দীদশার ফলে যেগুলি হারিয়েছেন সেগুলি ছাড়া।"

মামলাসূত্র: রামমূর্তি বনাম কর্নাটক রাজ্য, ১৯৯৭

* * *

"সুতরাং ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিচারপতিদের কর্তব্য তাঁদের নির্দেশে সাজাপ্রাপ্তদের অভিভাবকত্ব এবং প্রয়োজনে জেল পরিদর্শন করা।"

"বন্দী ও সংবিধানের মধ্যে কোনও লৌহ যবনিকা নেই... আদালতের একটা দায়িত্ব এটা নিশ্চিত করা যাতে বন্দীকে আটকে রাখার পেছনে যে সাংবিধানিক অভিপ্রায় সেটা যেন কারা কর্তৃপক্ষের কারণে পরাজিত না হয়।"

মামলা সূত্র: সুনীল বাত্রা (দ্বিতীয়) বনাম দিল্লি প্রশাসন, এ আই আর ১৯৮০

* * *

"যখন বড়লোকেরাই শুধু আইনি রক্ষাকবচ পায় এবং গরিব মানুষ তা থেকে বঞ্চিত হন— কেননা আইনের সাহায্য কেনার ক্ষমতা তাঁদের নাগালের বাইরে— তখন গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদটি আর কল্পনার স্তরে থাকে না, বরং ঘোর বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি নির্ভর করে বিচারব্যবস্থাকে এমনভাবে কার্যকর করার ওপরে যাতে প্রতিটি নাগরিক এই ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা ও ন্যায়ে বিশ্বাস করবেন এবং তার দ্বারা উপকৃত হবেন।"

মামলাসূত্র : এম এইচ হোসকত বনাম মহারাষ্ট্র, ১৯৭৮

* * *

"সময় এসে গিয়েছে গণবিবেককে জাগানোর এবং সরকার ও বিচারবিভাগেরও এটা বোঝার যে আমাদের কারাগারগুলির অন্ধ কুঠুরিগুলিতে বিরাট সংখ্য নারী ও পুরুষ ধৈর্য্য ধরে, বলা ভালো ধৈর্যহীনতার সঙ্গে বিচারের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তাঁদের অপেক্ষা বৃথাই, কেননা বিচার এমন একটি পণ্য যা এই ভাগ্যাহতদের আয়ত্তের বাইরে।"

মামলা সূত্র: হুসেনারা খাতুন এবং অন্যান্য বনাম স্বরাষ্ট্রসচিব, বিহার, এআইআর ১৯৭৯

* * *

"'দ্রুত বিচার' যৌক্তিক, পক্ষপাতহীন ও ন্যায়সঙ্গত বিচারের একটি আবশ্যিক শর্ত যা সংবিধানের ২১ নং ধারায় জীবনের সুরক্ষা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মৌলিক অধিকার দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।"

মামলাসূত্র: ঐ

* * *

"একদিকে জামিনের অধিকার অস্বীকার, অন্যদিকে বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা— এটা পরিষ্কারভাবে অন্যায়, অযৌক্তিক এবং আইন, (ফৌজদারি) কার্যবিধি এবং সংবিধানের বিরোধী।"

মামলাসূত্র: সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্য, ১৯৯৪

* * *

এই মামলাতেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ: যে সব মামলায় সাজা পাঁচ বছর বা তার বেশি বা কম হতে পারে সে সব ক্ষেত্রে বিচারাধীন বন্দী যদি কমপক্ষে অর্ধেক সাজাপর্ব ইতিমধ্যে পার করে থাকেন তাহলে তাকে জামিন দিতে হবে। যেখানে জরিমানার অঙ্ক নির্দিষ্ট করা আছে সেক্ষেত্রে সেই অঙ্কের অর্ধেক দিয়ে জামিন পাওয়া যাবে। দু জন জামিনদার লাগবে। যেখানে জরিমানা নির্দিষ্ট নয়, সেখানে আদালত জামিনের অঙ্ক ঠিক করবে। যেখানে দশবছর সাজা হতে পারে সেখানে পাঁচবছর জেলে কাটালে অভিযুক্তকে জামিন দিতে হবে। জরিমানার অঙ্ক এক লাখ টাকা হলে সেই পরিমাণ জামিনের অঙ্ক ঠিক হবে।

পরবর্তী একটি মামলায় (স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'কমন কজ' বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্য, ১৯৯৬) সুপ্রিম কোর্ট বলেন: দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা মামলায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত গরিব বিচারাধীন বন্দীরাই। তাঁদের নিয়মিত আদালতে হাজির করা হয় না এবং শুনানি অযৌক্তিকভাবে পিছিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে তাঁদের কারাবাসের মেয়াদ বাড়তেই থাকে। এই প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়: যে অপরাধের সাজা তিন বছর বা কম, এবং এক বছর বা বেশি সময় ধরে বিচার আটকে আছে, অথচ অভিযুক্ত ছয়মাস বা তার বেশি সময় জেলে থাকলে তাকে জামিনে বা ব্যক্তিগত বন্ডে ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে পাঁচ বছর ও সাত বছর বা তার কম সময়ের সাজার ক্ষেত্রে দুবছর বিচার আটকে থাকলে এবং বন্দী ছয় মাস থেকে একবছর বা বেশি সময় জেলে থাকলে তাকেও জামিনে বা ব্যক্তিগত বন্ডে ছাড়তে হবে। একবছর ও তিনবছর সাজার মেয়াদ থাকলে যথাক্রমে একবছর ও দুইবছরে বিচার শুরু না হলে বন্দী খালাস এবং মামলা বন্ধ করতে হবে। নন-কগনিজিবল এবং জামিনযোগ অপরাধের ক্ষেত্রে বিচার শুরু হতে দু বছর বা বেশি সময় লেগে গেলে অভিযুক্ত বন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে এবং তাকে বেকসুর খালাস করে মামলা বন্ধ করে দিতে হবে। 'কম্পাউন্ডেবল' অপরাধের ক্ষেত্রে বিচার শুরু না হয়ে থাকলে বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শুনে অভিযুক্তকে খালাস করে মামলা গুটিয়ে নিতে হবে। জরিমানাযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রেও এক বছর বা বেশি সময় বিচার চললে বা আদৌ শুরু না হলে অভিযুক্ত বন্দীকে খালাস করে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে।

তথ্যসূত্র: রাইট্স বিহাইন্ড বারস, কমনওয়েল্থ হিউম্যান রাইট্স ইনিশিয়েটিভ, দিল্লি ও লন্ডন

ব্যবস্থারও। এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ না করে অতিরিক্ত সময় চাওয়া এবং তদন্ত ও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়ার নামে কালবিলম্ব। অপরটি হচ্ছে 'কেস কানেকশন'। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, মামলার পর মামলায় ফাঁসিয়ে রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন আদালতে বছরের পর বছর ঘুরিয়ে মারার পুলিশি ব্যবস্থা কতটা ভয়াবহ হতে পারে। রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রে এটা দস্তুরে পরিণত বহুকাল ধরেই। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় রায় দিয়েছিলেন, আদালতের নির্দেশ বিনা কোনও মুক্তিপ্রাপ্ত বা জামিনপ্রাপ্ত বন্দীকে পুলিশ 'কেস কানেকশনে' গ্রেপ্তার করতে পারবে না। কিন্তু সেই নির্দেশ কোনও সরকারই কার্যকর করেননি।

বিচারপতি ও আইনজীবীদের ভূমিকা

সংবিধান, আইন এবং শীর্ষ আদালতের আইন-ব্যাখ্যা ও নির্দেশাবলী কার্যকর করার জন্য প্রশাসন-পুলিশের উপর নিরন্তর চাপ বজায় রাখার প্রধান দায়িত্ব বিচারবিভাগেরই। কিন্তু বিচারপতিদের পেশাগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ঘাটতি ক্রমশ প্রকট। এটা মানছেন প্রাক্তন বিচারপতি, প্রধান আইনজীবী এবং আইনজীবীদের নানান সংগঠন-সংস্থার নেতারাও। আজ যখন সর্বোচ্চ স্তরের বিচারপতিরা একে অপরের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন, তাঁদের কয়েকজনের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিতও হচ্ছে, তখন হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দিলীপ কুমার বসুর মতো মানুষেরা পূর্বসূরি বিচারপতি টি কে বসু, কৃষ্ণ আইয়ার, পি এন ভগবতী, ওয়াই ডি চন্দ্রচূড়, ডি এ দেশাই বা কুলদীপ সিংহদের কথা মনে করছেন। আইনজীবী এবং বিচারপতির ভূমিকায়, অভিযুক্ত ও বিচারাধীন বন্দীদের মানবাধিকার রক্ষায় তাঁর ভূমিকার জন্য স্মরণীয় ডি কে বসুর কথায়, পূর্বসূরি বিচারপতি টি কে বসু এবং পি সি বড়ুয়ার সাহায্য ছাড়া তিনি আইনজীবী হিসাবে জেলবন্দী মায়েদের সঙ্গে বিনা অপরাধে কয়েদ-খাটা শিশুদের মুক্তি এবং পুনর্বাসনে উদ্যোগ নিতে পারতেন না। একইভাবে বিচারপতি হওয়ার পর তথাকথিত মানসিকভাবে অসুস্থ ও ভবঘুরে মহিলা বন্দীদের মুক্তি এবং নকশালপন্থী বন্দীদের চিকিৎসায় তাঁর সক্রিয়তা শুধু আদালতের নির্দেশদানেই থেমে থাকেনি। আইনজীবী হিসাবে পুলিশি হেফাজতে অত্যাচার এবং বেআইনি ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে তার দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের ১৯৯৭ সালের রায় আজ দেশের মানবাধিকার আন্দোলনের কাছে একটি মাইলস্টোন। পুলিশ-প্রশাসন তা প্রায় কোথাও না মানলেও বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার জেরে পুলিশি যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। "আসলে আমরা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে পূর্বসূরিদের সামাজিক দায়বোধ এবং পেশাগত সক্রিয়তা দেখে উদ্বুদ্ধ হতাম। আজকের বিচারপতি এবং আইনজীবীদের মধ্যে সেই মানসিকতাটা হারিয়ে যাচ্ছে।" প্রবীণ বিচারপতি অবশ্য আশা হারাননি। সঙ্গী প্রবীণ আইনজীবী গীতানাথ গাঙ্গুলির মতো সতীর্থদের সঙ্গে মিলে ওয়েস্টবেঙ্গল লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস সংস্থার মাধ্যমে মানবাধিকার আইন বিষয়ে তরুণ আইনজীবী এবং নিম্ন আদালতের বিচারকদের মধ্যে আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন।

তাঁর পরের প্রজন্মের শরিক এবং হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শৈলেন্দ্র প্রসাদ তালুকদারও জেলবন্দীদের অধিকার রক্ষায় নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁর সরকারি ও বিচারবিভাগীয় নানা ভূমিকায়। তাঁর কথায়, "আদালতের দায়বদ্ধতা এবং দক্ষতা দ্রুত বিচারের অন্যতম প্রধান শর্ত। কিন্তু দুটিই কমে যাচ্ছে।" গাঙ্গুলির আক্ষেপ: আগে বিচারপতিরা স্বয়ং জেল পরিদর্শনে যেতেন অথবা প্রধান আইনজীবীদের *অ্যামিকাস কুরি* বা কোর্টের বন্ধু হিসাবে নিয়োগ করে সরেজমিন তদন্তে পাঠাতেন। তাঁদের রিপোর্টটি আদালতে পেশ হলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। এতে জেল-পুলিশ-প্রশাসনের যথেচ্ছাচার কিছুটা হলেও আটকানো যেত। "এখন না বিচারপতিদের সময় আছে না আইনজীবীদের," গীতানাথবাবুর মন্তব্য। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য: পাবলিক প্রসিকিউটর এবং ডিফেন্স কাউন্সিল মিলে অনেক সময় মামলার শুনানিতে বিলম্ব ঘটান। এতে পুলিশেরও যোগসাজস থাকে। রাজ্যে বার কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং প্রবীণ আইনজীবী শরদিন্দু বিশ্বাস আরও পরিষ্কারভাবে আইনজীবীদের অধিকাংশের অর্থ-সর্বস্বতার দিকে আঙুল তুলেছেন। "এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে দৌড়ে টাকা রোজগারের দৌড়ে নামছে অনেকেই। ফলে জেলবন্দী মক্কেলের কথা ভাবার সময় কোথায়? নামী উকিল আরও বেশি সময় নিচ্ছেন শুনানিতে হাজির হতে। এভাবেই ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যগুলিই ব্যাহত হচ্ছে।"

প্রধান আইনজীবী এবং প্রাক্তন বিচারপতিরা অনেকেই বিভিন্ন কমিটি, কমিশনের প্রতিধ্বনি করে নির্দিষ্ট সময়ে শুনানি শেষ করার উপর জোর দিয়েছেন। বিচারপতি তালুকদারের কথায়, এব্যাপারে প্রচলিত আইনে ধরা-বাঁধা সময়সীমা না থাকলেও ফৌজদারি কার্যবিধিতে দৈনিক শুনানির সুযোগ রাখা হয়েছে। "আইনজীবী ও বিচারপতিদের পারস্পরিক আস্থার উপর শুনানি অনেকটাই নির্ভর করে। আদালত চাইলে আইনজীবীদের সওয়াল-জবাবের সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।" তিনি এবং অন্যান্য সমমনস্ক বিচারপতি ও আইনজীবী একবাক্যে স্বীকার করছেন, দ্রুত বিচারের অধিকার মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার। সুপ্রিম কোর্টের নানা সময়ের ব্যাখ্যায় সংবিধানের ২১ নম্বর ধারার স্বীকৃত জীবনের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারের আলোয় এই অধিকারকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন এবং বিচারবিভাগকে সেইমতো তা রক্ষায় উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ৬৭তম স্বাধীনতা দিবসেও লক্ষ লক্ষ কারাবন্দী বিচারের অপেক্ষায়। তাঁদের অধিকাংশই নিরক্ষর, বিত্তহীন, সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর মানুষ। তাঁদের কাছে সংবিধানের মহতী বিধান, আইনের রক্ষাকবচ এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের উদ্বিগ্ন আশ্বাসের বাণী নিষ্ফলা বাগাড়ম্বরই হয়ে থাকছে। কেন? এর উত্তর দিতে হবে রাষ্ট্রের সকল অভিভাবককেই— সরকার, আইনপ্রণেতা, আইনরক্ষক তথা প্রশাসন এবং বিচারবিভাগ, সব পক্ষকেই। এবং সেটা শুধু জাতীয় স্তরে নয়, রাজ্য স্তরেও।

ঘরের পাশের বিদেশি

এই নিবন্ধে আমরা বিদেশি বিচারাধীন ও দণ্ডিতদের সম্পর্কে কোনও আলোচনায় যাইনি। কিন্তু তথ্য বলছে, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে জেলবন্দীদের মধ্যে বিদেশিদের সংখ্যাগুরু অংশই হলেন বাংলাদেশের মানুষ। দেশভাগের বিষময় ফল ভুগছে গোটা উপমহাদেশই। কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আর্থিক উন্নতি সত্ত্বেও সে দেশের হাজার হাজার গরিব মানুষ রুটিরুজির সন্ধানে চোরাপথে এদেশে 'অনুপ্রবেশ' করেন। যারা ধরা পড়েন, তাঁদের ঠাঁই হয় জেলে। দীর্ঘকাল বিচারের আশায় এঁরা জেলে পচেন। কারাদণ্ড শেষ হলেও মুক্তি মেলে না। এদের ফেরাতে দিল্লি-কলকাতা ও ঢাকা প্রশাসনের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলে। বাংলাদেশ সরকার অনেক সময়ই এঁদের সেদেশের নাগরিক বলে স্বীকার করে ফেরাতে চান না। এহেন বিড়ম্বিত 'রাষ্ট্রহীন' বিদেশিদের অনেকেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন জেলের অন্ধকারেই। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে সুব্রত মুখোপাধ্যায় নামে এক আইনজীবীর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় অন্তত ৩৭৫ জন বিদেশি নাগরিক কারাদণ্ড শেষের পরেও পশ্চিমবঙ্গের জেলে বন্দী আছেন বলে জানানো হয়েছে। শুনানি পর্বে বর্তমান ও প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিদ্বয় সাজা শেষেও এভাবে বিদেশিদের আটকে রাখার সরকারি সিদ্ধান্তকে 'অমানবিক ও অনৈতিক' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ঢাকা ও দিল্লির এলিটরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যান্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামালেও ভাগ্যবিড়ম্বিত কয়েক হাজার গরিব মানুষের মুক্তির স্বপ্ন ও ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দেয়নি আজও।

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর
৯৮৩০৯২২১৮৪ বা ৯৩৩১০১২৫৩৭

বরুণ দে: এক সামাজিক ঐতিহাসিক

সদ্য প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বরুণ দে (১৯৩২-২০১৩)। প্রায় অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে যাঁর ইতিহাস চর্চা আমাদের ইতিহাস বোধকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর বিশেষ চর্চা (specialisation) ছিল ভারতের অষ্টদশ শতাব্দীর ইতিহাস। কিন্তু তাঁর আরেক একটি বৈশিষ্ট্য হলো ইতিহালের যে কোনো ধারার ওপর প্রায় অগাধ পাণ্ডিত্য। তা সে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহই হোক বা আফগানিস্তানের ইতিহাসই হোক।

কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে। এর পর কাজ করেছেন নানা জায়গায়— কলকাতার আইআইএম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে। রাশিয়াতেও ছিলেন কয়েক বছর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি অবশ্যই সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা হিসাবে *সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস* গড়ে তোলা। এই গবেষণাকেন্দ্রটি সমস্ত প্রথিতযশা ঐতিহাসিকদের কাছে ছিল জ্ঞানচর্চার মহান কেন্দ্র, আর এর প্রাণপুরুষ অবশ্যই বরুণ দে।

কিন্তু বরুণ দে-র মধ্যে যে শিক্ষক সত্তাটি ছিল তার যথার্থ স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ৬০-এর দশকে আমরা যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি তখন আমাদের পড়াতেন পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাস। তখন বোঝবার ক্ষমতা ছিল অল্প, কিন্তু তাঁর বাচনভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি আমাদের মুগ্ধ করেছে। যাঁরা শুনেছেন বিষয় নির্বিশেষে তাঁরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য। শিক্ষক সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে শিক্ষকতার মধ্যে। কিন্তু যে কোনো রহস্যজনক কারণে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি স্থায়ী চাকরি পান নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আশুতোষ অধ্যাপক' পদ খালি হলেও রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে সেখানে তাঁর স্থান হয়নি। আবার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন্টর গ্রুপে আর এক রাজনীতির জন্য তাঁর ঠাঁই হলো না। এই শিক্ষকতা করতে না পারার বেদনা তিনি নিভৃতে অনেকের কাছেই ব্যক্ত করেছেন। অথচ বরুণ দে-কে শিক্ষক হিসাবে পেলে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও কিছু কৃতি ছাত্র তৈরি হতে পারত। দীপেশ চক্রবর্তীর 'আনন্দবাজারের' প্রতিবেদনে তার প্রমাণ মিলবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঐতিহাসিক বা লেখককে মনে রাখে তাঁর বইয়ের মাধ্যমে। অধ্যাপক দে সেই হিসাবে কোন উল্লেখযোগ্য বই লিখে যান নি। বহু মূল্যবান প্রবন্ধে অবশ্য নিহিত আছে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রকাশ। সেগুলিকে একসূত্রে গ্রথিতও তিনি করে যান নি। তাঁর ছাত্ররা বরুণ দে-র প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারেন এই প্রবন্ধগুলিকে একত্র করে প্রকাশ করে। পাণ্ডিত্যের নিরিখে বিচার করলে তাঁকে 'scholar extraordinary' বলতে দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

শুচিব্রত সেন

স্মরণ

ইন্দ্রদাকে যেমন দেখেছি

সন্তোষ রানা

এখন থেকে প্রায় অর্ধ শতকেরও বেশি সময় আগে ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সেটা ১৯৬০ সাল। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ থেকে সেই বছর আইএসসি পরীক্ষা দিয়েছি এবং ভালো ফল হবে বলে আশা করছি। ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে পড়ার সময়েই কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম শুনেছিলাম। সেখানে নাকি দেশের সব থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা পড়ে। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ থেকে শুরু করে রাজনীতি ও শিক্ষাজগতের নামি নামি মানুষেরা অনেকেই সেই কলেজে পড়েছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে গেলে তো কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে। সেটা ব্যয় সাপেক্ষ। আমার পরিবারের পক্ষে সেই খরচ বহন করা অসম্ভব ছিল। ঝাড়গ্রামের এক মাস্টারমশায়ের কাছে আমি কলকাতার ডাঃ বিধান রায় ছাত্র কল্যাণ আবাসের নাম (সাধারণভাবে বিধান ছাত্রাবাস নামেই পরিচিত) শুনেছিলাম। কিন্তু কলকাতায় আমি তখন কিছুই চিনি না। তবু আইএসসি-র ফল বেরোনোর কয়েকদিন আগে ১০ টাকা যোগাড় করে কলকাতা চলে এলাম। তখন ঝাড়গ্রাম থেকে হাওড়ার ট্রেন ভাড়া ছিল আড়াই টাকা। আমার আত্মীয় স্থানীয় এক ভদ্রলোক গ্রে স্ট্রীটে হাতিবাগান মোড়ে থাকতেন। অনেক খুঁজে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন যে বিধান ছাত্রাবাস পাইকপাড়ায়। ২ নম্বর বাস ধরলে পাইকপাড়া যাওয়া যাবে। আমি ২ নম্বর বাস ধরে পাইকপাড়া পৌঁছে বিধান ছাত্রাবাস খুঁজে বার করলাম।

ছাত্রাবাসের গেট দিয়ে ঢুকতেই এক দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর পরনে ছিল পাজামা আর গেঞ্জি। তিনি একটা মোটর সাইকেল নিয়ে ছাত্রাবাসের উঠোনে সেটা চালানোর চেষ্টা করছিলেন এবং বারবার পড়ে যাচ্ছিলেন। আমাকে ঢুকতে দেখেই তিনি ভারি গলায় প্রশ্ন করলেন, "কী চাই?" আমি আমার আসার উদ্দেশ্য বললাম। তিনি আমায় বসতে বলে আমার কথা শুনলেন। বললেন যে ভালো নম্বর না পেলে এখানে ভর্তি হওয়া যাবে না। ফল বেরোনোর পর মার্কসিট নিয়ে আসতে বললেন। এই ভদ্রলোকই ইন্দ্রনাথ মজুমদার।

আইএসসি পরীক্ষায় আমার ফল ভালোই হয়েছিল (জেলায় প্রথম এবং রাজ্যে প্রথম পনোরো জনের মধ্যে)। প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স অনার্সে প্রথম তালিকাতেই আমার নাম ছিল এবং বিধান ছাত্রাবাসে ভর্তির জন্য রাজভবনে তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ঘরে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। আমি শুনেছিলাম যে এই হোস্টেল কংগ্রেসি নেতা-মন্ত্রীরা চালান। আমার কোন নেতা-মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। তাই শঙ্কা ছিল যে এখানে হয়তো আমার ভর্তি হওয়া হবে না। কিন্তু ইন্টারভিউ-র সময় প্রফুল্লবাবু বা শ্রী শম্ভুনাথ মল্লিক (হোস্টেলের সুপার) কেউই কংগ্রেসি যোগাযোগের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করলেন না। ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রী শম্ভুনাথ মল্লিক নির্বাচিতদের নামের তালিকা ঘোষণা করে দিলেন। তাঁর ঘোষণায় প্রথম নাম ছিল আমার এবং দ্বিতীয় নাম ছিল মেদিনীপুর কলেজ থেকে পাশ করা শ্রী দেবীদাস মুখোপাধ্যায়ের। দেবী আমার চেয়ে ৭ নম্বর কম পেয়েছিল এবং জেলায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল। জুলাই মাসে ক্লাশ শুরু হল এবং বিধান ছাত্রাবাসে ইন্দ্রদার তত্ত্বাবধানে আমাদের বসবাস ও পড়াশোনা শুরু হল। সেখানে বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং পড়াশোনার জন্য মস্ত বড় লাইব্রেরি ছিল। একই বছরে বিধান ছাত্রাবাসে ভর্তি হয় অসীম চট্টোপাধ্যায়। সে বীরভূম জিলা স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারির প্রথম ব্যাচ। একই বছরে আরো দুজন জিলা স্কুল থেকে এসেছিল— শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আলোক রায়। তারা থ্রি ইয়ার ডিগ্রি কোর্সের ফার্স্ট ইয়ারে আর আমরা টু-ইয়ার ডিগ্রি কোর্সের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলাম।

ছাত্রাবাসে নিজেদের জামাকাপড় নিজেদেরই কাচতে হত। রবিবার দিন নিজেদের ঘরদোর বাথরুম সাফ করতে হল এবং খাওয়ার পর থালাবাসন মেজে রাখতে হত। এটা খুবই ভাল ব্যবস্থা ছিল। আমরা যারা ছাত্র-আবাসিক তার বাইরে আরো দুজন নিয়মিত থাকতেন। পলিটিক্যাল সায়েন্সের পঞ্চম বর্ষের কৃতী ছাত্র শ্রী রাধারমণ চক্রবর্তী এবং ইন্দ্রদা। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের শ্রী শম্ভুনাথ মল্লিক হোস্টেলের সুপার হলেও দৈনন্দিন পরিচালনা করতেন ইন্দ্র-দা।

১৭/১৮ বছর বয়সি কিছু ছেলে আমরা গ্রাম থেকে শহরে এসেছি। এই বয়সটায় উপযুক্ত পথনির্দেশ না পেলে বিপথে যাওয়ার বিপদ থাকে। এই সময়টায় আমরা ইন্দ্রদার কাছ থেকে সেই পথনির্দেশ পেয়েছিলাম। তিনি একাধারে ছিলেন বন্ধু এবং অভিভাবক। পড়ার বই ছাড়াও নানা ধরনের বই, খবরের কাগজ ও পত্রপত্রিকা পড়তে উৎসাহিত করতেন। এই হোস্টেলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে শ্রী প্রফুল্ল সেন, শ্রী অতুল্য ঘোষ ও রাজ্য কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের যাতায়াত ছিল। কিন্তু ইন্দ্রদার মত অভিভাবকরা কখনো আমাদের কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন নি। বরং আমরা নিজেরা পড়াশোনা করে যেন দুনিয়াটাকে চিনতে পারি এবং

ভালোমন্দের তফাত করতে পারি সেভাবেই তিনি সাহায্য করতেন।

শুধু পড়াশোনা নয়, কলকাতা শহরে কীভাবে চলাফেরা করতে হবে, কোন দোকানে মিষ্টি ভাল, বাজারে গেলে কীভাবে সেরা সবজী ও মাছ-মাংস কিনতে হবে এই সব ব্যাপারেও ইন্দ্রদা ছিলেন আমাদের গাইড। হোস্টেলের কাঁচা বাজার আমরা ছাত্ররাই করতাম। দুজন করে পালা হতো। ইন্দ্রদা শেখাতেন কীভাবে সে সব কিনতে হবে।

একবার হোস্টেল থেকে আমাদের সবাইকে মুর্শিদাবাদ বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হল। অভিভাবক যথারীতি ইন্দ্রদা। আমরা হাজারদুয়ারি, নন্দকুমারের বাড়ি ইত্যাদি দেখলাম। বহরমপুরের এক ছাত্র বিকাশ আমাদের দলে ছিল। তার বাড়িও আমরা গিয়েছিলাম।

পাইকপাড়া এলাকায় তখন কমিউনিস্ট পার্টির ভালই প্রভাব ছিল। ১৯৬২-র বিধানসভার ভোটে সিপিআই ঐ এলাকায় লোকসভায় শ্রী হীরেন মুখার্জি ও বিধানসভায় শ্রী গণেশ ঘোষকে প্রার্থী করেছিল। তাঁরা দুজনেই জিতেছিলেন। হোস্টেলের ছেলেরা ইতিমধ্যে ভোটার হয়ে গেছিল। তাদের বেশির ভাগ সিপিআই প্রার্থীদের ভোট দিয়েছিল। কিন্তু হোস্টেল কর্তৃপক্ষ কখনো তাঁদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন নি।

বিএসসি পাশ করার পর আমি সায়েন্স কলেজে এ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স-এ ভর্তি হই। বিধান ছাত্রাবাসে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রদের রাখা হত না। আমি সেন্ট্রাল কলকাতায় মেসে হস্টেলে থেকে এবং ছাত্র পড়িয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাই। এরপর দীর্ঘদিন ইন্দ্রদার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না।

তাঁর সঙ্গে আবার দেখা ১৯৭৮ সালে। আমার ততদিনে ছয় বছর জেলখাটা হয়ে গেছে। এমএলএ ভোটে জিতে জেল থেকে বেরিয়েছি। বোলপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা করতে গেছি। সেখানে ইন্দ্রদা হাজির।

তিনি ততদিনে বোলপুরে বাসা নিয়েছেন এবং বইয়ের দোকান দিয়েছেন। তিনি সভা থেকেই আমাকে তাঁর বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন এবং নিজে লেমন-চিকেন রান্না করে খাওয়ালেন।

এরপর কলকাতায় তাঁর দোকান সুবর্ণরেখায় অথবা বোলপুরে এবং বইমেলায় বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। একবার বোলপুর থেকে ফেরার পথে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে উঠেই ইন্দ্রদার সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর পাশের সিটে বসিয়ে অনেক গল্প বললেন। কেন বিধান ছাত্রাবাস তৈরি করা হয়েছিল সেই কাহিনীও তাঁর মুখ থেকে সেদিন শুনি। তখন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় অনেক গ্রামীণ নেতা-মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সচিব পর্যায়ের অফিসাররা প্রায় সকলেই ছিলেন কলকাতার। সেই গ্রামীণ মন্ত্রীরা ডাঃ রায়ের কাছে অভিযোগ করেন যে শহুরে আমলারা তাঁদের কথা ও সমস্যা বুঝতে পারেন না। তখন কংগ্রেসের রাজ্য হাইকমান্ড ঠিক করে যে গ্রামীণ এলাকার কিছু মেধাবী ছাত্রকে এনে পড়াশোনার সব সুযোগ দিতে হবে যেন তারা আইএএস পরীক্ষায় বসতে পারে। সেজন্যই রাজনৈতিক রং না দেখে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রদের ভর্তি করা হত।

আমার সঙ্গে যে ২৮ জন সহ-আবাসিক ছিল তারা কেউই অবশ্য আইএএস হয়নি। অবশ্য তাদের অনেকেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছে এবং নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এই আবাসিকদের মধ্যে শুধু দুজন (আমি এবং অসীম চ্যাটার্জী) সক্রিয় রাজনীতিতে যাই। ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যাঁরা আমার সঙ্গে পড়তেন তাঁদের অনেকে আইএএস হয়েছিলেন।

ইন্দ্রদার মৃত্যুর খবর আমি প্রথমে পাই অসীমের কাছ থেকে। সে বরাবরই ইন্দ্রদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত।

ইন্দ্রদাকে আমি মনে রাখবো একজন উদার মনের বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে, যিনি আমার দুনিয়াটাকে জানা ও চেনার প্রাথমিক পর্বে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ দিয়েছিলেন।

দীপংকর চক্রবর্তী স্মরণে

অনীক সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী নানান লিটল ম্যাগাজিন ও অন্যত্র নানা বিষয়ে লিখেছেন। আমরা তাঁর সব লেখা সংগ্রহের একটি প্রচেষ্টা নিচ্ছি। সবাইকে অনুরোধ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ইত্যাদিতে তাঁর লেখা সংগ্রহে থাকলে বা জানা থাকলে আমাদের জানান বা পিবিএস-এ জমা দিন।

যোগাযোগ : অনীক - ৯৮৩০১ ৪৩৩৬৫
পিপল্স বুক সোসাইটি - ২২১৯-৯২৫৬